বাংলা

দাখিল নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট
ব্রেজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু

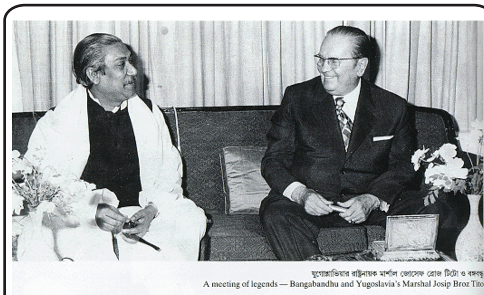

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটোর সাথে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব
কুর্ট ওয়াল্ডহেইম এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এর মাধ্যমে ১১৬টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালসহ ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

দাখিল

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
মোহাম্মদ শেখ সাদী
সৈয়দা ফারিহা লাহারিন
উম্মে হাবিবা
প্রণয় ভূঞাঁ
ফিরোজ আল ফেরদৌস
সফিকুল আলম বকশ

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

চিত্রণ

প্রমথেশ দাস পুলক

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নবম শ্রেণির বাংলা বই রচনা করার সময়ে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে—

১. বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারা;

২. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে পারা;

৩. বিভিন্ন ধরনের গদ্য রচনা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা;

৪. শব্দের বিভিন্ন ধরনের রূপান্তর সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অভিধান ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষা প্রয়োগে দক্ষ হয়ে ওঠা;

৫. বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখতে পারা;

৬. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক উপলব্ধি করা এবং সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা; এবং

৭. কোনো বিষয়ে মত ও ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারা, ভিন্নমত গ্রহণ করতে পারা এবং আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে গঠনমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারা।

অনান্য শ্রেণির বাংলা বইয়ের মতো নবম শ্রেণির বাংলা বইয়েরও মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বাড়ানো এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করা। ব্যাকরণের এমন কোনো বিষয় বইয়ে রাখা হয়নি যার কোনো প্রায়োগিক গুরুত্ব নেই। তাছাড়া ব্যাকরণ শেখার কাজটি যাতে ক্লান্তিকর না হয়, সেজন্য কিছু আনন্দদায়ক কাজ ও নমুনা-পাঠ যোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, এমন কিছু সাহিত্য-পাঠ যোগ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থী তার নিজের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক খুঁজে পাবে। সাহিত্য নির্বাচনের সময়ে এটাও বিবেচনায় রাখা হয়েছে যাতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে।

প্রমিত ভাষা শেখার সঙ্গে সাহিত্যের পাঠগুলো যাতে সাংঘর্ষিক না হয়, সেজন্য নির্বাচিত পাঠের কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দরূপের পরিবর্তন করা হয়েছে এবং শ্রেণি-অনুযায়ী যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কোনো কোনো পাঠ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য পাঠ-উপকরণ এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সহায়তা নিয়ে তাদের ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্যজ্ঞান বাড়াতে পারবে। আগের শ্রেণিগুলোর মতো নবম শ্রেণির বইটিও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হলো।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি		১
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রমিত ভাষা ব্যবহার করি		১৫
	১ম পরিচ্ছেদ	ধ্বনির উচ্চারণ	১৫
	২য় পরিচ্ছেদ	শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ	২৪
	৩য় পরিচ্ছেদ	লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	রচনা পড়ি দৃষ্টিভঙ্গি বুঝি		৩৯
	১ম পরিচ্ছেদ	প্রায়োগিক লেখা	৩৯
	২য় পরিচ্ছেদ	বিবরণমূলক রচনা	৪৪
	৩য় পরিচ্ছেদ	তথ্যমূলক রচনা	৫১
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	বিশ্লেষণমূলক রচনা	৬০
	৫ম পরিচ্ছেদ	কল্পনানির্ভর লেখা	৬৭
চতুর্থ অধ্যায়	ব্যাকরণ মেনে লিখতে শিখি		৭৮
	১ম পরিচ্ছেদ	শব্দ	৭৮
	২য় পরিচ্ছেদ	বাক্য	৮৪
	৩য় পরিচ্ছেদ	শব্দের অর্থ	৮৭
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	বানান ও অভিধান	৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি		১০০
ষষ্ঠ অধ্যায়	সাহিত্য পড়ি সাহিত্য লিখি		১১৩
	১ম পরিচ্ছেদ	কবিতা	১১৩
	২য় পরিচ্ছেদ	গল্প	১৬২
	৩য় পরিচ্ছেদ	প্রবন্ধ	১৮৬
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	নাটক	১৯৩
সপ্তম অধ্যায়	আলোচনা করি, ভিন্নমত বিবেচনায় নিই		২১৩

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি

১.১ মাধ্যম ও উপকরণের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিভিন্ন মাধ্যমে এই যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। মাধ্যম অনুযায়ী যোগাযোগের উপকরণও নানা রকম হয়।

ক) যোগাযোগের মাধ্যম

নিচে যোগাযোগের তিনটি মাধ্যম দেখানো হলো। তুমি কী উদ্দেশ্যে, কার সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ করে থাকো, তার একটি করে উদাহরণ দাও।

যোগাযোগের মাধ্যম	যেভাবে যোগাযোগ করা হয়	কী উদ্দেশ্যে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করি
প্রত্যক্ষ মাধ্যম	যখন কারো সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়	
লিখিত মাধ্যম	যখন লিখে যোগাযোগ করা হয়	
যান্ত্রিক মাধ্যম	যখন যোগাযোগে যন্ত্রের ব্যবহার হয়	

খ) যোগাযোগের উপকরণ

নিচে যোগাযোগের মাধ্যম এবং এই মাধ্যমে যেসব উপকরণের ব্যবহার হয়, তা দেখানো হলো। এর মধ্যে যেসব উপকরণ তুমি ব্যবহার করো, তা ডানের কলামে লেখো।

যোগাযোগের মাধ্যম	যোগাযোগের উপকরণ	কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করি
প্রত্যক্ষ মাধ্যম	বাক্‌প্রত্যঙ্গ, কান, হাত, আঙুল, চোখ, ইশারা, সংকেত	
লিখিত মাধ্যম	কাগজ, কলম, পেনসিল, বই, ব্ল্যাকবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড, পত্রিকা, দেয়ালপত্রিকা, ছবি	

যোগাযোগের মাধ্যম	যোগাযোগের উপকরণ	কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করি
যান্ত্রিক মাধ্যম	মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার, মাইক, হেডফোন, রেডিও, টেলিভিশন, অডিও রেকর্ডার, ক্যামেরা, স্ক্যানার	

যোগাযোগের মাধ্যম ও উপকরণ

যোগাযোগ মানেই দুই জন বা আরো বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আমরা প্রধানত দুটি কাজ করি: নিজের চিন্তা-অনুভূতি-চাহিদা প্রকাশ করি এবং অন্যের চিন্তা-অনুভূতি-চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি। এসব কাজের জন্য আমরা যেসব উপায় অবলম্বন করি, সেগুলোকে বলে যোগাযোগের মাধ্যম। নিচে যোগাযোগের তিনটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো:

১. **প্রত্যক্ষ মাধ্যম:** প্রত্যক্ষ মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক পক্ষ বলে এবং অন্য পক্ষ শোনে। এক্ষেত্রে গলার স্বর, কথার সুর, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, তাকানোর ধরন ইত্যাদি দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

২. **লিখিত মাধ্যম:** লিখিত মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখা ও পড়ার কাজটিই মুখ্য। এ ধরনের যোগাযোগের নমুনা: চিঠিপত্র, সাহিত্য, নোটিশ, ব্যানার, মোড়ক, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, সাইনবোর্ড, প্রতিবেদন, অ্যাসাইনমেন্ট, পত্রপত্রিকা, ছবি ইত্যাদি।

৩. **যান্ত্রিক মাধ্যম:** যান্ত্রিক মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার হয়। এ ধরনের যোগাযোগের নমুনা: এসএমএস, ই-মেইল, অনলাইন মিটিং, অডিও-ভিডিও কল, সিনেমা ইত্যাদি।

কখনো আমরা শুধু একটি মাধ্যমে যোগাযোগ করি, কখনো একইসঙ্গে একাধিক মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। যেমন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ে একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং লিখিত যোগাযোগ—দুটি মাধ্যমই ব্যবহার করা হয়।

যোগাযোগ করার সময়ে আমরা নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করি। যেমন:

১. **প্রত্যক্ষ উপকরণ:** সরাসরি কথা বলার সময়ে বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয়; যেমন—বাক্‌প্রত্যঙ্গ, কান, হাত, আঙুল, চোখ, ইশারা, সংকেত ইত্যাদি।

২. **লিখিত উপকরণ:** লিখে ভাব প্রকাশের সময়ে বা লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয়; যেমন—কাগজ, কলম, পেনসিল, বই, পত্রিকা, দেয়ালপত্রিকা, ব্ল্যাকবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড, ছবি ইত্যাদি।

৩. **যান্ত্রিক উপকরণ:** যোগাযোগে যেসব যন্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়; যেমন—মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার, মাইক, হেডফোন, রেডিও, টেলিভিশন, অডিও রেকর্ডার, ক্যামেরা, স্ক্যানার ইত্যাদি।

১.২ যোগাযোগের নমুনা বিশ্লেষণ

নিচে কয়েকটি যোগাযোগের নমুনা দেওয়া হলো। নমুনাগুলোয় যেসব মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখো এবং নমুনার শেষে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে উত্তর সংশোধন করো।

নমুনা ১

প্রেক্ষাপট: শ্রেণিকক্ষে ক্লাস চলছে।

কোন মাধ্যমে এখানে যোগাযোগ করা হয়েছে?	
যোগাযোগে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে?	
এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?	
এই যোগাযোগে আর কোন মাধ্যম ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত?	

নমুনা ২

কনকসার উচ্চ বিদ্যালয় নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এজন্য তারা নিচের আমন্ত্রণপত্রটি তৈরি করেছে।

নজরুল জয়ন্তী ১৪৩১

সুধী

আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৫শে মে ২০২৪, শনিবার সকাল ১০টায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কনকসার উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে একটি আলোচনা-সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আজমল বারি। ‘নজরুল কেন এখনো প্রাসঙ্গিক’ এই শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন নজরুল গবেষক ড. দীনেশ সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নাজনিন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

রাইসুল হোসেন
সম্পাদক, সংস্কৃতি সংসদ
কনকসার উচ্চ বিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানসূচি
১০:০০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:০৫ : ‘নজরুল কেন এখনো প্রাসঙ্গিক’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ
১০:৩০ : প্রধান অতিথির বক্তব্য
১০:৪৫ : সভাপতির ভাষণ
১১:০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কোন মাধ্যমে এখানে যোগাযোগ করা হয়েছে?	
যোগাযোগে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে?	
এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?	
এই যোগাযোগে আর কোন মাধ্যম ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত?	

নমুনা ৩

কাহারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক জিনাত শারমিন নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দলীয় অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন। অ্যাসাইনমেন্টটি ইমেইলের মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এভাবে ইমেইল পাঠিয়েছে:

প্রতি: jinat05.kaharganj@gmail.com

বিষয়: স্থানীয় পুরাকীর্তির পরিচয়।

শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম,

আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী দলগতভাবে প্রস্তুত করা অ্যাসাইনমেন্টটি এখানে সংযুক্ত করা হলো।

আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে আপনার মতামত পেলে তা সংশোধন করে আবার মেইলে পাঠাতে পারব।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাসহ—

নবম শ্রেণি, দল-১

কোন মাধ্যমে এখানে যোগাযোগ করা হয়েছে?	
যোগাযোগে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে?	
এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?	
এই যোগাযোগে আর কোন মাধ্যম ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত?	

নমুনা ৪

প্রেক্ষাপট: রায়হান সাহেব একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করেন। তাঁর অফিসে জরুরি মিটিং চলছে। একজন সহকর্মী অনলাইনে মিটিংয়ে যুক্ত হয়েছেন।

কোন মাধ্যমে এখানে যোগাযোগ করা হয়েছে?	
যোগাযোগে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে?	
এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?	
এই যোগাযোগে আর কোন মাধ্যম ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত?	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নমুনা ৫

যোগাযোগের একটি বিশেষ ধরনের মাধ্যম হলো সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখকের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটে। এটি একটি লিখিত যোগাযোগ।

নিচে হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) লেখা একটি সাহিত্য-নমুনা দেওয়া হলো। লেখাটি তাঁর 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসের অংশবিশেষ। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'জোছনা ও জননীর গল্প' ইত্যাদি।

আগুনের পরশমণি

হুমায়ূন আহমেদ

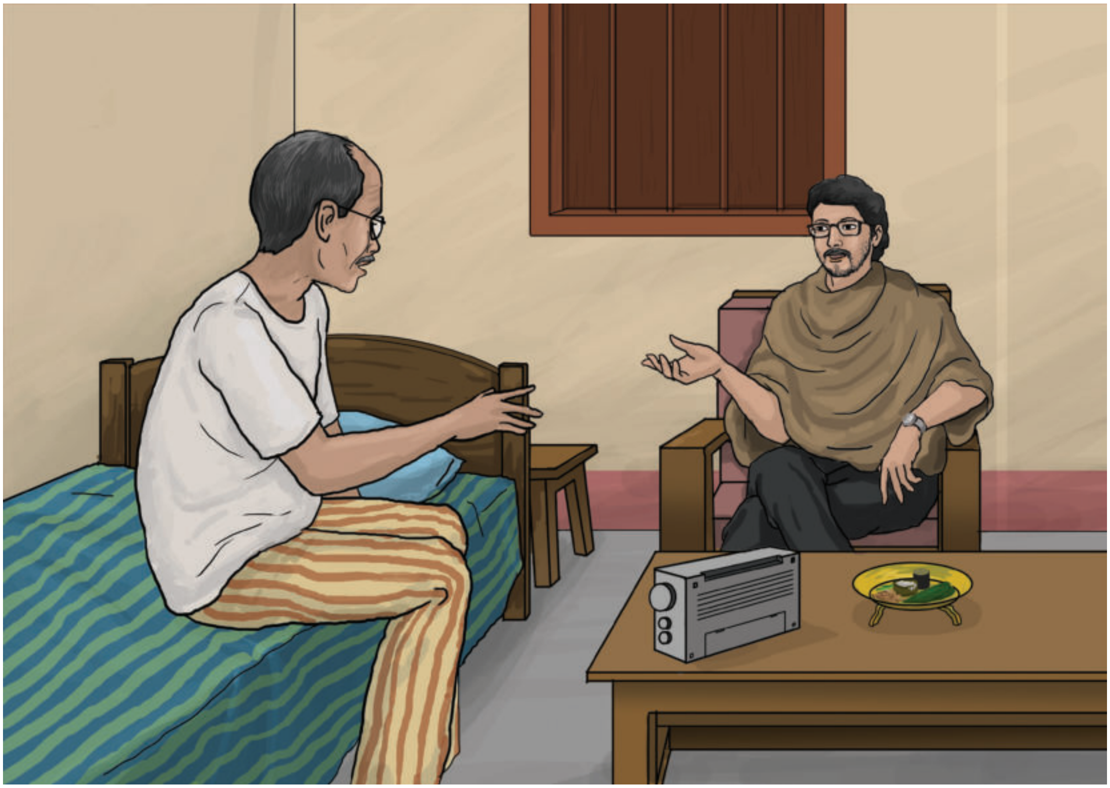

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় কেউ আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষ মুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে?

অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে বোধ হয় কার্ফুর সময় হয়েছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময়ে লক্ষ করল গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, 'আপনি কি মতিন সাবের বাড়ি খুঁজেন?'

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল—

: লোহার গেইট আছে। গেইটের কাছে একটা নাইরকল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছয়টার সময় কার্ফু।

ইদ্রিস মিয়া হন হন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটোখাটো। প্রায় দৌড়াচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছটার আগে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দুটি ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভারেই যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড়ো ভালো লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, 'মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব।' বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ তারিখ। বুধবার। উনিশশো একাত্তর সন। একটি ভয়াবহ বৎসর। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতরে একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে শহরে ঢুকেছে সাতজনের একটি ছোট্ট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড়ো বড়ো চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, 'মতিন সাহেব, মতিন সাহেব।'

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে। এরই কি আসার কথা?

: আমার নাম বদিউল আলম।

: এসো বাবা, ভেতরে এসো।

সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে! তিনি চাপা স্বরে বললেন, 'কেমন আছ তুমি?'

: ভালো আছি।

: সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?

: না।

: বলো কি!

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, ‘এসো, ভেতরে বসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

: গেটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

: ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সংকুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়। চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন।

: গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি-ডাকাতির ভয়ে না। চুরি-ডাকাতি কমে গেছে। চোর-ডাকাতরা এখন কীভাবে বেঁচে আছে কে জানে। বোধ হয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হলো এই ছেলেটির কোনো দিকেই কোনো উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে কিন্তু কোনো কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেই গা ছেড়ে দেয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগলেন—

: কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি। এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে—রাত্রি আর অপালা। ওরা তার ফুফুর বাড়িতে। সোমবার আসবে। ওদের ফুফু, মানে আমার বোনের কোনো ছেলেপুলে নেই। মাঝেমধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদের ফুফুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন—অবস্থা কী বলো শুনি।

: কিসের অবস্থা?

: তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

: ভালোই।

: আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কী করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পড়ার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটা ভিন্ন ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোতারা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে—ভালো বলেছেন। কিন্তু এবারে সে রকম কিছু হলো না। মতিন সাহেবের ভয় হলো ছেলেটা হয়তো শুনছেই না।

: তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

: চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধে না হয়।

: না না, অসুবিধে কিসের? কোনো অসুবিধে নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দিই।

: গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়ার সময়ে নিজেই দু-একটা কথা বললেন। যেমন একবার বললেন, 'তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও।' ছেলেটি তার জবাবে অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয় বারে বললেন, 'ছোটো মাছ তুমি খেতে পারছ না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।'

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্য প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হলো। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে—না না লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, 'আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন।' মতিন সাহেব বললেন, 'এখুনি শোবে কি? বসো, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না?'

: জি না। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার আমার কোনো আগ্রহ নেই।

: বলো কি তুমি! কখনো শোনো না?

: শুনেছি মাঝে মাঝে।

তিনি খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে না সে কারণে নয়। ছেলেটি দুবার কথার মধ্যে তাঁকে বলেছে মতিন সাহেব। এ কি কাণ্ড! চাচা বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে, কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন? তিনি কি তার ইয়ার দোস্তদের কেউ? এ কেমন ব্যবহার?

ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোটো ঘরটায় ব্যবস্থা হলো। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমবে বারান্দায়। এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার

হলো না। চৌকির নিচে রসুন ও পেঁয়াজ। বস্তায় ভর্তি চাল-ডাল। এসব থেকে কেমন একটা টক টক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, 'তুমি এ ঘরে ঘুমতে পারবে তো? না পারলে বলো, আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দিই। একটা ক্যাম্পখাট আছে, পেতে দেবো?'

: লাগবে না।

: বাথরুম কোথায় দেখে যাও।

বদিউল আলম বাথরুম দেখে এলো।

: কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।

: আমার কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুরমা চৌকির এক প্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটা কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখল।

: আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?

: হ্যাঁ।

: বলুন।

: তুমি কে আমি জানি না। কোত্থেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কী জন্যে এসেছ তা আন্দাজ করতে পারি।

: আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কী জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই।

: তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কী বলছি সেটা মন দিয়ে শোনো।

: বলুন।

: তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।

: ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।

: দুটি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি, কোনো রকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাচ্ছি?

: পারছি।

: তুমি কাল সকালে চলে যাবে।

: কাল সকালে যাওয়া সম্ভব না। সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুট করে কিছু বদলানো যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।

সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কি কাণ্ড!

: তোমার জন্যে আমি আবার মেয়েগুলোকে নিয়ে বিপদে পড়ব? এসব তুমি কী বলছ?

: বিপদে পড়বেন কেন? বিপদে পড়বেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরের বার আমি এখানে উঠব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুফুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পর আসবে।

: তুমি থাকবেই?

: হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন, সেটা অন্য কথা। তা দেবেন না। সেটা বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল, এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মতো লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটির এই রূপটিই তার ভালো লাগল। কেন লাগল তিনি বুঝতে পারলেন না।

: আলম।

: বলুন।

: ঢাকা শহরে কি তোমার বাবা-মারা থাকেন?

: হ্যাঁ থাকেন।

: কোথায় থাকেন?

: শহরেই থাকেন।

: বলতে কি তোমার অসুবিধা আছে?

: হ্যাঁ আছে।

: তুমি এক সপ্তাহ থাকবে?

: হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকারে নগরী ডুবে গেল। ঝুম বৃষ্টি নামল।

শব্দের অর্থ

কার্ফু: কারফিউ; বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার সরকারি নির্দেশ।

ক্যাম্পখাট: কাঠ ও মোটা কাপড়ে তৈরি খাট।

গেরিলা অপারেশন: নিজেকে গোপন করে শত্রুকে ঘায়েল করার যুদ্ধ।

ঝুম বৃষ্টি: প্রবল বৃষ্টি।

ডায়ালগ: সংলাপ।

বিক্রিবাটা: বেচাকেনা।

স্বাধীন বাংলা বেতার: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পরিচালিত বাংলাদেশের বেতারকেন্দ্র।

‘আগুনের পরশমণি’ সাহিত্য-নমুনার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কোন মাধ্যমে এখানে যোগাযোগ করা হয়েছে? এই মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের তফাত কী?	
এই যোগাযোগে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে? একজন লেখক লেখার সময়ে কী কী উপকরণ ব্যবহার করেন এবং একজন প্রকাশক প্রকাশের সময়ে কী কী উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন?	
এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী? উপরের সাহিত্য-নমুনায় লেখক কী ধরনের অভিজ্ঞতা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন?	
এই যোগাযোগে আর কোন কোন মাধ্যম ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত? ভিডিও মাধ্যমে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন কী কী উপকরণের প্রয়োজন হবে?	

১.৩ বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ

দলে ভাগ হও। প্রত্যেক দল আলাদা আলাদাভাবে বিদ্যালয়ের বা এলাকার কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করো। সমস্যাটি সমাধানের জন্য কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং কোন মাধ্যমে ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে হবে, তা আলোচনা করে ঠিক করো। এরপর যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করো। নিচে কিছু নমুনা বিষয় দেওয়া হলো।

বিদ্যালয়ের সমস্যা:

- বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আছে।
- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বইয়ের সংখ্যা কম।
- বিদ্যালয়ের সামনে শব্দদূষণ।

এলাকার সমস্যা:

- বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথের খারাপ অবস্থা।
- বিদ্যালয়ের সামনে রিকশা ও গাড়ির জট।
- বিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি খালের উপর সেতু নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমিত ভাষা ব্যবহার করি

১ম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির উচ্চারণ

উচ্চারণ ঠিক রেখে কবিতা পড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে আছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ' ইত্যাদি। তিনিই প্রথম বাংলা ছোটোগল্প রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসের মধ্যে আছে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটক 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'রাজা' ইত্যাদি।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতাটি কবির 'কাহিনী' কাব্য থেকে নেওয়া। কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো। সরবে পাঠ করার সময়ে ধ্বনির উচ্চারণে সতর্ক থাকতে হবে।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই—
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—

ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো ॥

ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার—এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাক-পাতা!

আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন—
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি।
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী—হলে দাসী।

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা ॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এলো মালী।
ঝুঁটিবাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ—
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!'
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোরে ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে ॥

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

উড়ে: ওড়িশার লোক।

উদিল: উদয় হলো।

ক্রূর: নিষ্ঠুর; নির্দয়।

ক্ষুধাহরা: ক্ষুধা দূর করে এমন।

খত: ঋণের দলিল।

ঘটে থাকা: ভাগ্যে থাকা।

ঠাঁই: স্থান।

ঠেকানু: ঠেকালাম।

ডিক্রি: আদালতের নির্দেশপত্র।

দিঘে: দৈর্ঘ্যে।

ধাম: তীর্থস্থান।

বিজন: জনমানুষহীন।

বিবাগি: উদাসীন।

ভূরি ভূরি: প্রচুর।

ভূধর: পাহাড়।

ভূস্বামী: জমিদার।

ভ্রমি: ভ্রমণ করি।

মোহ: লোভ।

লক্ষ্মীছাড়া: দুর্ভাগা।

সপ্তম সুরে: চড়া গলায়।

হেরিলাম: দেখলাম।

২.১.১ স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করি

একেকটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান ও ঠোঁটের অবস্থা একেক রকম হয়। ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতা থেকে কিছু শব্দ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো। শব্দগুলো বার বার উচ্চারণ করো এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে ছকে থাকা প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও। এরপর শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও। নিচে প্রথমটি করে দেখানো হলো।

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দে থাকা স্বরধ্বনি	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে জিভ কতটুকু উঁচু হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে জিভ সামনে না পিছনে উঁচু হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট গোল না প্রসারিত হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলে?
নিলাজ, বিলাস, দাসী	ই	• জিভ উঁচু হয় √ • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে √ • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয় √	• অল্প খোলে √ • বেশি খোলে

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দে থাকা স্বরধ্বনি	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে জিভ কতটুকু উঁচু হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে জিভ সামনে না পিছনে উঁচু হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট গোল না প্রসারিত হয়?	স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলে?
সেই, বটে, হেনকালে, এ জমি	এ	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে
একদিন, একে একে, গেছে	অ্যা	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে
আমি, আনচান, আঁচল	আ	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে
অন্ত, অবারিত, সজল	অ	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে
ওটা, চোর, মোর	ও	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে
ফুল, দুপুর, বাবু	উ	• জিভ উঁচু হয় • জিভ একটু উঁচু হয় • জিভ নিচু থাকে	• সামনে • মাঝখানে • পিছনে	• ঠোঁট গোল হয় • ঠোঁট প্রসারিত হয়	• অল্প খোলে • বেশি খোলে

স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য

বাংলা স্বরবর্ণ এগারোটি। কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি। যথা: ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস বাক্‌যন্ত্রের কোথাও বাধা পায় না। কিন্তু একেকটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান ও ঠোঁটের অবস্থা একেক রকম হয়।

ই: ‘ই’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ উঁচু হয়; তাই এটি উচ্চ স্বরধ্বনি।

জিভ সামনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি সম্মুখ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট প্রসারিত হয়; তাই এটি প্রসৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট অল্প খোলে; তাই এটি সংবৃত স্বরধ্বনি।

এ: ‘এ’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ একটু উঁচু হয়; তাই এটি মধ্য স্বরধ্বনি।

জিভ সামনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি সম্মুখ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট প্রসারিত হয়; তাই এটি প্রসৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট অল্প খোলে; তাই এটি সংবৃত স্বরধ্বনি।

অ্যা: ‘অ্যা’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ একটু উঁচু হয়; তাই এটি মধ্য স্বরধ্বনি।

জিভ সামনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি সম্মুখ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট প্রসারিত হয়; তাই এটি প্রসৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট বেশি খোলে; তাই এটি বিবৃত স্বরধ্বনি।

আ: ‘আ’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ নিচু থাকে; তাই এটি নিম্ন স্বরধ্বনি।

জিভ মাঝখানে নিচু থাকে; তাই এটি মধ্য স্বরধ্বনি।

ঠোঁট গোল ও প্রসারিত হয়; তাই এটি গোলাকৃত ও প্রসৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট বেশি খোলে; তাই এটি বিবৃত স্বরধ্বনি।

অ: ‘অ’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ একটু উঁচু হয়; তাই এটি মধ্য স্বরধ্বনি।

জিভ পিছনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট গোল হয়; তাই এটি গোলাকৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট বেশি খোলে; তাই এটি বিবৃত স্বরধ্বনি।

ও: ‘ও’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ একটু উঁচু হয়; তাই এটি মধ্য স্বরধ্বনি।

জিভ পিছনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট গোল হয়; তাই এটি গোলাকৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট অল্প খোলে; তাই এটি সংবৃত স্বরধ্বনি।

উ: ‘উ’ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে—

জিভ উঁচু হয়; তাই এটি উচ্চ স্বরধ্বনি।

জিভ পিছনের দিকে উঁচু হয়; তাই এটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

ঠোঁট গোল হয়; তাই এটি গোলাকৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁট অল্প খোলে; তাই এটি সংবৃত স্বরধ্বনি।

স্বরধ্বনির ছক

জিভের অবস্থান ও ঠোঁটের অবস্থার ভিত্তিতে স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে ছকে দেখানো যায়:

	সম্মুখ	**মধ্য**	**পশ্চাৎ**
উচ্চ	ই		উ
উচ্চ-মধ্য	এ		ও
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

জিভের অবস্থানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনি

'ই' উচ্চারণের সময়ে জিভ সামনে উঁচু হয়; তাই উপরের ছকে 'ই' স্বরধ্বনিকে সম্মুখ অবস্থানে দেখানো হয়েছে। এর মানে জিভের অবস্থানের ভিত্তিতে 'ই' সম্মুখ স্বরধ্বনি। একইভাবে 'এ', 'অ্যা'—এগুলোও সম্মুখ স্বরধ্বনি। আবার 'উ' উচ্চারণের সময়ে জিভ পিছনে উঁচু হয়; তাই 'উ' স্বরধ্বনিকে পশ্চাৎ অবস্থানে দেখানো হয়েছে। এর মানে জিভের অবস্থানের ভিত্তিতে 'উ' পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। একইভাবে 'ও', 'অ'—এগুলোও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। 'আ' উচ্চাণের সময়ে জিভের অবস্থান মাঝখানে থাকে; তাই 'আ' মধ্য স্বরধ্বনি।

যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ বেশি উঁচু হয়, সেগুলো উচ্চ স্বরধ্বনি। ই, উ—এ দুটি উচ্চ স্বরধ্বনি। আবার 'আ' উচ্চারণে জিভ নিচু থাকে; তাই এটি নিম্ন স্বরধ্বনি। বাকি স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে জিভ একটু উঁচু হয়; তাই এ, অ্যা, অ, ও মধ্য স্বরধ্বনি।

ঠোঁটের অবস্থার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি

যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট প্রসারিত হয়, সেগুলোকে বলে প্রসৃত স্বরধ্বনি। 'ই', 'এ', 'অ্যা'—এগুলো প্রসৃত স্বরধ্বনি। যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট গোল হয়, সেগুলোকে বলে গোলাকৃত স্বরধ্বনি। 'উ', 'ও', 'অ'—এগুলো গোলাকৃত স্বরধ্বনি।

যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে, সেগুলোকে বলা হয় সংবৃত স্বরধ্বনি। 'ই', 'এ', 'উ', 'ও'—এগুলো সংবৃত স্বরধ্বনি। আর যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে, সেগুলোকে বলে বিবৃত স্বরধ্বনি। 'অ্যা', 'আ', 'অ'—এগুলো বিবৃত স্বরধ্বনি।

২.১.২ উচ্চারণ ঠিক করি

জিভের জড়তা কাটানোর জন্য সাতটি মূল স্বরধ্বনি উচ্চারণের অনুশীলন করো। স্বরধ্বনিগুলো পরপর কয়েকবার সঠিকভাবে এই ক্রমে উচ্চারণ করো: ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। এরপর বিপরীতক্রমে স্বরধ্বনিগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করো: উ, ও, অ, আ, অ্যা, এ, ই।

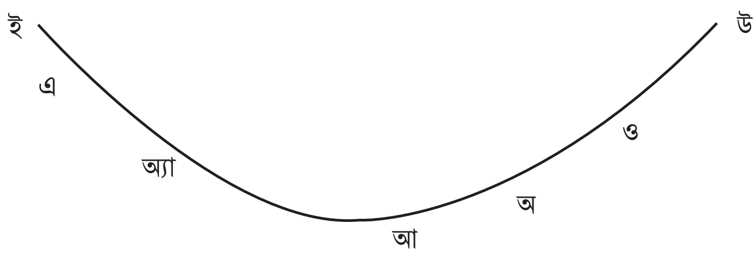

কোনো কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে আমাদের ভুল হয়ে থাকে। অপর পৃষ্ঠার সারণিতে কিছু শব্দের প্রমিত উচ্চারণ দেখানো হলো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দ	যেভাবে উচ্চারণ করব
অনেক	অনেক্
একাডেমি	অ্যাকাডেমি
একে একে	অ্যাকে অ্যাকে
এক	অ্যাক্
একই	অ্যাক্ই
একটা	অ্যাক্টা
এতই	অ্যাতোই
আলো	আলো
উড়াল	উড়াল্
একি	একি
একটি	এক্টি
ওঠে	ওঠে
অতি	ওতি
ওরা	ওরা
গেছে	গ্যাছে
চোর	চোর্
দেশ	দেশ্
ধুলা	ধুলা
হলো	হোলো

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন', 'আগুনপাখি' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি সরবে পড়ো।

ফেরা

হাসান আজিজুল হক

আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো?

দক্ষিণবঙ্গের লোকের কথায় সামান্য যে একটা টান থাকে, সেই টানের সঙ্গে সে বারদুয়েক ভেবে দেখার চেষ্টা করল, আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো? বাঁ পায়ের বুটটা সে তখন ছাড়েনি, হাঁটুর উপরে সেটা চেপে ধরে ডান হাতে রাইফেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে আর একবার কেন যুদ্ধে গিয়েছিল ভেবে দেখার চেষ্টা করে।

আজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময়ে সে আমিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি। হাসপাতালের লোকেরা তাকে লাল কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলে তার কিছুই করতে ইচ্ছে করেনি। আমিন মরে গেলে কম্বল সরিয়ে তার মরা মুখ দেখার জন্যে আলেফ হাসপাতালে তিন দিন বসে ছিল। আসলে আমিন মরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই তার কাজ ছিল। তার মাকে সে সঠিক খবরটা দিতে চায়। আমিন ফিরে আসবে—এই আশায় অনর্থক কেন বুড়ি বসে থাকবে—তার সম্পর্কে পাকা খবরটা পেলে বরং তার কিছু কাজ হয়। ডান ঠ্যাংটা কেটে ফেলার তিন দিন পর সমস্ত শরীর পচে গিয়ে আমিন মরে গেল।

বাড়ি সে পৌঁছে যায় ভোরের দিকে ঠিকই। যেমন আন্দাজ করেছিল তার অনেক পরে। গাঁয়ের রাস্তায় সে উঠে আসে। তার পিছু পিছু খালের দিক থেকে একটা ভারী কুয়াশা এসে গাঁয়ের দিকে চলে যায়। আলেফ দেখল তাদের বাড়িটা আগাগোড়া কুয়াশায় মোড়া, বলতে গেলে বাড়িটায় ঢোকার রাস্তা সে প্রথমে খুঁজে পায়নি। বুটজুতো জোড়া সে ফেলে দিয়ে এসেছে, এজন্যে যখন তাদের একমাত্র ঘরের ভাঙা দরজার দিকে এগিয়ে যায়—উঠোন পেরিয়ে সে বেড়ালের মতোই নিঃশব্দে দাওয়ায় ওঠে—কোথাও কোনো শব্দ হয় না। আলেফ দরজায় ধাক্কা না দিয়ে ডাকল, মা।

আলেফ রে, উরে আমার বাপরে! এতদিন কনে ছিলি বাপ?

আমি ফিরে আইছি মা, বাঁচে ছিলি তালি?

তোর জন্যি মরিনি, তোর জন্যি বাঁচে আছি বাপ।

ভালো করিছো—আলেফ হাসে। কুয়াশা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

আলেফের হাসিটা আবছা দেখায়, সে মায়ের মুখটাও ভালো দেখে না।

ভালো ছিলি আলেফ? মা বলে।

হ।

কিছু হয়নি তো তোর?

সামান্য উপদ্রুত মনে হয় আলেফকে। সে বলে, না, কিছু হয়নি। লোক আইছিলো আমার খোঁজ নিতি?

একদিন মিলিটারি আইলো গাঁয়ে আগুন দিতি।

আগুন দিইছে?

হ। আগুন দিইছে, সব বাড়ি পোড়ায়ে দিইছে। কয় ছ্যামড়া আমার বাড়ি আস্যে তর খোঁজ নেলে অনেক।

তুমি কি বললে?

আগুনে গাঁ পোড়াতে লাগলো—সেকি আগুন তোরে কবো আলেফ—ছ্যামরা কডা আমারে কয়—ও বুড়ি

আলেফ কনে?

আমি বললাম, আলেফের খোঁজ জানে কিডা? আমি মরতিছি নিজের জ্বালায়। সে কোঁয়ানে মরতিছে তার আমি কী জানি? আলেফ, আমি ঠিক বলিনি?

ঠিক বলিছো? তোমার আলেফ ছিল কনে কও তো দেহি।

তুই নড়াইয়ে ছিলি বাপ—আলেফের মা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বউয়ের দিকে ফিরে আবার বলল বুড়ি, বউ ফিরে আইছে দেহেছিস?

দেহেছি।

বউ যেদিন ফিরলো—বুড়ি বকবক করে। আনন্দে তার ঘাড় নড়বড়ে করে দোলে। মুখ থেকে থুতু ছোটে। মা কিছুতেই থামতে চায় না। আলেফ তাকে অনেকক্ষণ বলতে দিয়ে হঠাৎ বলে, ঠিক আছে মা। বুড়ি চুপ করে। তারপর ঘরের বাইরে চলে যায়। বউ অন্ধকারে কোণে গিয়ে লুকিয়েছে। মা চলে গেলে আলেফ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সে কী করবে বুঝতে পারে না। মায়ের নোংরা বিছানার কাছে গিয়ে সে সটান শুয়ে পড়বে কি না, চিন্তা করতে থাকে। ফর্সা হয়ে আসছিল। ভোরবেলাকার ঠান্ডা বাতাস এ সময়ে হু হু করে ঘরে এসে ঢোকে।

দরজাটা বন্ধ করে দে—ঠান্ডা বাতাস আসতিছে—আলেফ বউয়ের দিকে ফিরে বলে। বউ দরজা বন্ধ করতে গেলে আলেফ একবার ঘরের ভিতরটা নজর করে দেখে।

বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। একপাশে তার ব্যাগটা পড়ে আছে। ঘরের কোণে রাইফেলটার নল এই আবছা আলোতেও চকচক করছে। দরজা বন্ধ করে বউ ফিরে আসতে আলেফ ক্লান্ত গলায় বলে, কবে ফিরে আলি তুই?

বিড়বিড় করে সে কী বলল বোঝা গেল না। আলেফ হেঁকে উঠল, আঁ?

বউ বলল, শ্রাবণ মাসে।

ফিরলি ক্যানো?

না ফিরে কী করবো?

তাইলি গিইলি ক্যানো?

লাল ম্যাড়মেড়ে আলোর মধ্যেও আলেফ দেখতে পায়, বউয়ের দুচোখ জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কোথা ছিলি?

মজমপুর।

খাতি পাইছিলি? খাবার জন্যিই তো গিইলি। তা খাতি পাইছিলি তো?

বউ খুব জোরে জোরে মাথা নাড়ল। জমা জল ঝরে পড়ল ঝরঝর করে।

তয়?

আমি অনেকদিন আগে আইছি। তখন তুমি ছিলে না।

আমি কোঁয়ানে ছিলাম?

তুমি নড়াইয়ে ছিলে। আলেফ মনে করে দেখল একটু আগে তার মা-ও ঠিক এই কথাটাই বলেছে।

চুপ কর—আলেফ অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে উঠল। বউ থমকে যায়। আমি মারা যাতিছিলাম জানিস—আলেফ বসে পড়ে লুঙ্গিটা গুটিয়ে হাঁটুর উপরে তুলতে তুলতে বলে, এইখানে গুলি ঢুকিছিল। বউ সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে, চোখ খুব কাছে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুকনো ক্ষতটা দেখে। আলেফ নিজেও কোনোদিন ভালো করে দেখেনি। জায়গাটার রং এখনো ফ্যাকাশে সাদা, কাটা আর ছেঁড়া মাংস জোর করে সেলাই করে দেওয়ায় উঁচু হয়ে আছে।

আর এট্টু উফর দিয়ে গেলে হাঁটুর হাড়টা ভাঙে যাতো—আলেফ বলল।

তালি কী হতো?

হাঁটু খে কাটে ফালায়ে দিতি হতো। আর তাতে হতো কী আমি মরে যাতাম—হাসতে হাসতে এই কথা বলতে গিয়ে আলেফের আমিনের কথা মনে পড়ে গেল।

তোমার কোনো বেকায়দা হয়?

ঠ্যাংটা এট্টু খাটো হয়ে গিছে।

আলেফের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মায়ের ছেঁড়া কাঁথা বিছানো দুর্গন্ধ বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়তে গেলে সে কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা দড়িটার আর একবার সন্ধান পায়। সে আবার বলে, এই ঠ্যাংটা এট্টু খাটো হয়ে গিছে। চোখ বন্ধ করেও আলেফ ঘুমাতে পারে না, ঘুম ঘুম গলায় সে জিগ্যেস করে, লড়াই শেষ হয়ে গিছে জানিস? দ্যাশের কী হলো ক দিনি?

দ্যাশ স্বাধীন হইছে—বউ যেন মুখস্থ বলল।

আলেফ প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘোঁৎ একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জেগে গিয়ে সে বলে, আমরা রাজা-বাদশা হবো নাকি বল তো? রাজা বাদশা হবানে মনে হয়।

বউ প্রতিবাদ করল, তা ক্যানো? রাজা বাদশা হবো ক্যানো? আমাদের কষ্ট আর থাকবে না।

মানে?

ভাত-কাপড় পাবানি।

ঠিক কচ্ছিস? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আলেফ চোখ খুলে চেয়ে রইল বউয়ের দিকে। তার মাথায় একটা কথাও ঢুকছিল না, একঘেয়ে গলায় সে বলল, স্বাধীনতার মানে ভালোই বুঝিছিস বলে মনে হতিছে। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলেফের নাক ডাকতে শুরু করে, তবে আরো একবার সে আধো ঘুমের মধ্যে বলে ওঠে,

ললিতনগরের খালে চিংড়ি ধরবানে দেহিস, এক একটা চিংড়ি আধসের ওজনের—এই পেল্লায় বড়ো চিংড়ি।

মা বলে, কোথা তোর গুলি লাগিছিলো আর একবার দেখা না বাপ। আলেফ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে গুলি-খাওয়া জায়গাটা বের করে মাকে বোঝাতে শুরু করে, গুলিটা লাগিলো ঠিক এইখানে। আমি ভাবতিছি শালা খানেরা বোধ হয় ভয়ে পলান দিছে। ঝোপ থেকে বেরোয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্তর আর সুঁই করে গুলিটা একেবারে—

তরে সরকার থে ডাকবে না?

আলেফ হাঁ হয়ে যায়, সরকার আমাকে ডাকপে? ক্যানো?

তোরে ডাকপে না তো কারে ডাকপে? গুলিটা যদি তোর মাথায় লাগতো আলেফ?

তা সরকার আমাকে ডাকপে ক্যানো?

তোরে একা না ডাকুক, তোরা যারা নড়াইয়ে ছিলি তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহেরা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গোরু আর দুটো বলদ কিনবি—আর—

হইছে—তুমি থোও দেহি—আমিনের পচা লাশটার গন্ধ এসে হঠাৎ ভক করে আলেফের নাকে লাগে।

সে বলে, দুটো খাতি দাও, আমি একবার বেনেপুর যাবো।

বেনেপুর যাবি? ক্যানো?

বেনেপুরের এক ছ্যামড়া ছিল আমাদের সাথে। গুলি তার উরতে লাগিলো। হাসপাতালে তার ঠ্যাংটা কাটে ফেলায়ে দিলো। তিন দিনের মদ্যি পচে গন্ধ হয়ে ছ্যামরাটা মরিছে। তার মারে খবরটা দিতে যেতি হবে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

উপদ্রুত: বিপদগ্রস্ত।

কচ্ছিস: বলছিস।

কৌয়ানে: কোথায়।

গিইলাম: গেলাম।

গিইলি: গেলি।

ছ্যামরা: ছেলে।

ডাকপে: ডাকবে।

দাওয়া: বারান্দা।

ধরবানে: ধরব।

নড়াই: লড়াই।

পেল্লায়: মস্ত বড়ো।

মদ্যি: মধ্যে।

মাত্তর: মাত্র।

ম্যাড়মেড়ে: অনুজ্জ্বল।

সুঁই করে: শোঁ করে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২.২.১ প্রমিত রূপ প্রমিত উচ্চারণ

'ফেরা' গল্পের কথোপকথনে বহু আঞ্চলিক শব্দ আছে। গল্প থেকে বাছাই করে পনেরোটি আঞ্চলিক শব্দ নিচের ছকের বাম কলামে লেখো। মাঝখানের কলামে শব্দটির প্রমিত রূপ লিখবে এবং ডান কলামে এর প্রমিত উচ্চারণ লিখবে। নিচে দুটি করে দেখানো হলো।

আঞ্চলিক শব্দ	প্রমিত রূপ	প্রমিত উচ্চারণ
মদ্যি	মধ্যে	মোদ্‌ধে
ঠ্যাং	পা	পা

২.২.২ ভাষারূপের পরিবর্তন

'ফেরা' গল্পের কথোপকথনে ব্যবহৃত দশটি বাক্য নিচের ছকের বাম কলামে লেখো এবং ডান কলামে বাক্যগুলোর প্রমিত রূপ নির্দেশ করো। একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
এতদিন কনে ছিলি বাপ?	এতদিন কোথায় ছিলি বাবা?
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	

প্রমিত ভাষা

অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। ভাষার এইসব রূপকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। কোনো শব্দ অঞ্চলভেদে আলাদাভাবে উচ্চারিত হতে পারে, কিংবা একই অর্থ বোঝাতে আলাদা শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। বাক্যের গঠনও অনেক সময়ে আলাদা হয়। আঞ্চলিক ভাষা সাধারণত মানুষের প্রথম ভাষা—এই ভাষাতেই মানুষ কথা বলা শুরু করে। গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

ভাষার এই আঞ্চলিক রূপ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে কিছু সমস্যা তৈরি করে। সেই সমস্যা দূর করার জন্য ভাষার একটি রূপকে প্রমিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যাতে সব অঞ্চলের মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। একই কারণে দেশের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে, শিক্ষা কার্যক্রমে, দাপ্তরিক কাজে, গণমাধ্যমে, সাহিত্যকর্মে ভাষার প্রমিত রূপ ব্যবহৃত হয়। সকল অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে ভাষার এমন রূপের নাম প্রমিত ভাষা।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কথ্য প্রমিত লেখ্য প্রমিত

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে।

কবিতা-গল্প-উপন্যাসে কখনো কখনো শব্দের কথ্য প্রমিত রূপ দেখা যায়। তবে আনুষ্ঠানিক গদ্যে শব্দের কথ্য প্রমিত রূপের পরিবর্তে লেখ্য প্রমিত রূপ ব্যবহার করা শ্রেয়। যেমন, শব্দের কথ্য প্রমিত রূপ—ধুলো, ফিতে, ভেতর ইত্যাদি। এগুলোর লেখ্য প্রমিত রূপ—ধুলা, ফিতা, ভিতর ইত্যাদি।

নিচের উদাহরণগুলো দেখো এবং লেখার সময়ে বিষয়টি খেয়াল রেখো।

কথ্য প্রমিত	লেখ্য প্রমিত
অসুবিধে	অসুবিধা
ওপর	উপর
ঘুমোয়	ঘুমায়
জুতো	জুতা
টুকরো	টুকরা
তক্ষুনি	তখনই
তুলো	তুলা
দেখবার	দেখার
দেবার	দেওয়ার
দেয়া	দেওয়া
ধুলো	ধুলা
নানান	নানা
নেয়া	নেওয়া
পিঠে	পিঠা

কথ্য প্রমিত	লেখ্য প্রমিত
ফিতে	ফিতা
বেরোয়	বের হয়
ভিটে	ভিটা
ভেতর	ভিতর
মতন	মতো
মুক্তো	মুক্তা
মুলো	মুলা
রুপো	রুপা
লাখো	লাখ লাখ
সন্ধে	সন্ধ্যা
সবচে	সবচেয়ে
সুতো	সুতা
হাজারো	হাজার হাজার
হিরে	হীরা

২.২.৩ আঞ্চলিক ভাষা থেকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর করি

তুমি তোমার চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে শুনে কিছু আঞ্চলিক বাক্য সংগ্রহ করো। নিচের ছকের বাম কলামে সংগৃহীত আঞ্চলিক বাক্যগুলো লেখো। এরপর ডান কলামে বাক্যগুলোকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর করো। বাক্য সংগ্রহের সময়ে খেয়াল রেখো যাতে বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক—সব ধরনের বাক্যই থাকে।

সংগৃহীত আঞ্চলিক বাক্য	রূপান্তরিত প্রমিত বাক্য
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	

৩য় পরিচ্ছেদ

লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একজন লেখক ও সমাজ-সংস্কারক। 'বর্ণপরিচয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিচে সাধু রীতিতে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি গল্প দেওয়া হলো। গল্পটি লেখকের 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

গল্পটি সরবে পড়ো। পড়ার সময়ে সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অনুসর্গের রূপগুলো খেয়াল করো।

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আলী ইবনে আব্বাস নামে এক ব্যক্তি মামুন নামক খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে খলিফার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন।

খলিফা আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কল্য আমার নিকট উপস্থিত করিবে। তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ যদি তিনি পালাইয়া যান, আমাকে খলিফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কাস আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কাস নগরের, বিশেষত যে অংশে আপনার বাস তাহার ওপর, জগদীশ্বরের শুভদৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি একসময় আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম: বহু বৎসর পূর্বে ডেমাস্কাসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পালাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলাম এবং গৃহস্বামীর নিকট গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, একমাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থান করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী স্থাপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয়, আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতি স্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখ প্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনো কোনো উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনো অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাসকাল আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে

লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম এবং কী দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলিফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্তে নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতির লোক ঈর্ষাবশত শত্রুতা করিয়া খলিফার নিকট আমার ওপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; বোধ করি আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন; এই বলিয়া পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার ওপর খলিফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনোই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না। আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনো হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার ওপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে। যদি আপনার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও আমার কোনো ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি খলিফার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুমতি হইলে সবিশেষে সমস্ত আপনাকে গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া খলিফা উদ্ধত বচনে বলিলেন, কী বলিতে চাও, বল। তখন সে ব্যক্তি ডেমাস্কাস নগরে কীরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনোমতে সম্মত হইলেন না, এই দুই বিষয়ে সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক তিনি কখনোই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসুক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশত অমূলক দোষারোপ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, নতুবা যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনো দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এ ক্ষেত্রে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

খলিফা মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর প্রসন্ন বদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ ইহা অবগত হইয়া

আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে তোমা হইতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাহাকে অবিলম্বে এই সংবাদ দাও ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া আহ্লাদের সাগরে মগ্ন হইয়া আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহাকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলিফা অবলোকনমাত্র, প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ প্রকৃতির লোক তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া খলিফা তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন এবং ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

শব্দের অর্থ

অনন্তর: তারপর।
অবধারিত: নিশ্চিত।
অবরুদ্ধ: বন্দি।
অবলোকনমাত্র: দেখামাত্র।
অভিরুচি: ইচ্ছা।
অব্যাহতি: মুক্তি।
আজ্ঞা: আদেশ।
আহ্লাদিত: আনন্দিত।
উৎকট: তীব্র।
উদ্দেশ: খোঁজ।
উষ্ট্র: উট।
কর্ণগোচর করা: শোনা।
কল্য: পরের দিন।
কিয়ৎক্ষণ: কিছুক্ষণ।
কোপ: ক্রোধ।
কোপানল: ক্রোধের আগুন।
খলিফা: শাসনকর্তা।
ডেমাস্কাস: দামেস্ক।
তদীয়: তার।
দুরাচার: খারাপ আচরণকারী।
দুরাত্মা: খারাপ লোক।
নিষ্কৃতি: মুক্তি।
নীত হওয়া: আনা।
পরিচ্ছদ: পোশাক।
প্রতীতি: বিশ্বাস।
প্রত্যাগমন: ফিরে আসা।
প্রত্যুপকার: উপকারীর প্রতি উপকার।
প্রফুল্ললোচনে: আনন্দিত চোখে।
প্রসন্ন বদনে: খুশি মনে।
প্রাতঃকালে: অতি ভোরে।
বচন: কথা।
মৌনতাবলম্বন: নীরবতা পালন।
রুদ্ধ: বন্দি।
রোষারক্ত নয়ন: ক্রোধে লাল চোখ।
সদ্বিবেচক: সুবিবেচনাকারী।
সমভিব্যাহারে: সঙ্গীসাথি সহযোগে।
সম্ভাষণ: সম্বোধন।
স্নেহাস্পদ: স্নেহভাজন।
হস্তপদবদ্ধ: হাত-পা বাঁধা।

২.৩.১ সাধু রীতির বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর

'প্রত্যুপকার' গল্প থেকে সাধু রীতির দশটি বাক্য নিচের ছকে দেওয়া আছে। বাক্যগুলোকে প্রমিত গদ্যরীতিতে রূপান্তর করে ডান কলামে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে নাও। একটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

সাধু রীতির বাক্য	প্রমিত রূপ
১. আমি একদিন অপরাহ্নে খলিফার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন।	১. আমি একদিন বিকেলে খলিফার কাছে বসে আছি, এমন সময়ে হাত-পা বাঁধা এক ব্যক্তিকে তাঁর সামনে আনা হলো।
২. তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কল্য আমার নিকট উপস্থিত করিবে।	২.
৩. তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।	৩.
৪. কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার নিবাস কোথায়?	৪.
৫. ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি একসময় আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন।	৫.
৬. পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন।	৬.
৭. তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না।	৭.
৮. আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনোই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না।	৮.
৯. এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।	৯.
১০. তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।	১০.

সাধু রীতি

সাধু রীতি হলো লিখিত বাংলা ভাষার একটি সেকেলে রূপ। একসময়ে লিখিত ভাষার আদর্শ রূপ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। উনিশ ও বিশ শতকের প্রচুর সাহিত্যকর্ম এই রীতিতে লেখা হয়েছে। এই রীতিতে কিছু কিছু সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুসর্গের রূপ প্রমিত রীতির তুলনায় সাধারণত দীর্ঘতর হয়। যেমন: তার—তাহার, তোমাদের—তোমাদিগকে, যাবে—যাইবে, ভাবতে লাগল—ভাবিতে লাগিল, হতে—হইতে, বাইরে—বাহিরে ইত্যাদি।

২.৩.২ সাধু রীতির গদ্যকে প্রমিত রীতিতে রূপান্তর

তোমরা দলে ভাগ হও। দলের সব সদস্য 'প্রত্যুপকার' গল্পের আলাদা আলাদা অংশ প্রমিত রীতিতে রূপান্তর করে 'আমার বাংলা খাতা'য় লেখো। এরপর দলগতভাবে পুরো কাজটি নিয়ে আলোচনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

রচনা পড়ি দৃষ্টিভঙ্গি বুঝি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

৩.১.১ প্রায়োগিক লেখার বৈচিত্র্য

কী কী ধরনের প্রায়োগিক লেখার সঙ্গে তুমি পরিচিত হয়েছ, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

প্রয়োগিক লেখার ধরন	এ ধরনের লেখা কী কাজে লাগে

প্রায়োগিক লেখা: সংবাদ প্রতিবেদন

নমুনা ১

ফলের গাছ লাগিয়ে সফল হাবিবুর রহমান

১৯শে ডিসেম্বর ২০২৩, সাতক্ষীরা। নিজস্ব প্রতিনিধি।

ফলের গাছ লাগিয়ে সফল হয়েছেন সাতক্ষীরার তালা উপজেলার যুবক হাবিবুর রহমান। দুই একর জমির উপর তিনি দশ-বারো রকমের ফলের গাছ লাগিয়েছেন। গত বছর ফলের বাগান থেকে তিনি প্রায় দেড় লাখ টাকার ফল বিক্রি করেন।

হাবিবুর রহমান একজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি চাকরির পিছনে ছোটেননি; বরং পারিবারিক এক একর জমির সঙ্গে আরও এক একর জমি ইজারা নিয়ে চার বছর আগে ফলের বাগান করা শুরু করেন। সরেজমিনে তালা উপজেলায় গিয়ে দেখা যায়, হাবিবুর রহমান ১০০টি বিভিন্ন জাতের আম গাছ, ২০০টি লেবু গাছ, ১৫০টি পেয়ারা গাছ, ১৫০টি পেঁপে গাছ এবং ১০০টি আমড়া গাছ লাগিয়েছেন। এর বাইরেও কিছু লিচু গাছ, চালতা গাছ, জামরুল গাছ এবং সফেদা গাছ আছে। এ বছর তিনি আম বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা, লেবু বিক্রি করে ২০ হাজার টাকা, পেয়ারা থেকে ১০ হাজার টাকা, পেঁপে থেকে ২০ হাজার টাকা

এবং আমড়া থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করেন।

হাবিবুর রহমানের সফলতা দেখে এলাকার অনেকেই এখন ফলের গাছ লাগানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। একই উপজেলায় অন্তত তিন জন গত এক বছরের মধ্যে নতুন করে ফলের গাছ রোপণ করেছেন। হাবিবুর রহমানের ছোটো ভাইও পড়াশোনার পাশাপাশি বড়ো ভাইয়ের কাজে সহায়তা করছেন। নতুন চারাগাছ লাগানো, কীটনাশক ছিটানো, ফল তোলা—এসব কাজে সহায়তা নেওয়ার জন্য হাবিবুর রহমানের বাগানে অতিরিক্ত দুই জন লোক কাজ করেন। সামনের দিনগুলোতে তিনি আরো কিছু জমি ইজারা নিয়ে বাগান বড়ো করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো লোক হাবিবুরের বাগান দেখতে আসছেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন।

নমুনা ২

বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীন-বরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা

মনীষা তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান, ২৯শে জানুয়ারি ২০২৪

বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৮শে জানুয়ারি ২০২৪ রবিবার বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীন-বরণ এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুটিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উদয় কুমার চাকমা। তিনি বলেন, এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীদের তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার আহ্বান জানান এবং ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন।

এ বছর বিদ্যালয়টির মানবিক শাখা থেকে ৫০ জন, বিজ্ঞান শাখা থেকে ৪০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ২৫ জনসহ সর্বমোট ১১৫ জন পরীক্ষার্থী আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় ত্রিপুরা এই নবীন-বরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ললিত বিশ্বাস, বালুটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহিতুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এ দিনের সাড়ম্বর আয়োজন সমাপ্ত হয়।

৩.১.২ পড়ে কী বুঝলাম

উপরের দুটি নমুনা রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার সহপাঠীর সঙ্গে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করো, সংক্ষেপে এগুলোর উত্তর তৈরি করো এবং উপস্থাপন করো। উপস্থাপনের পরে শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করো।

ক. এ ধরনের লেখা কোথায় দেখা যায়?

খ. এ ধরনের লেখার উদ্দেশ্য কী?

গ. এসব লেখাকে প্রায়োগিক লেখা বলা হয় কেন?

ঘ. সংবাদ প্রতিবেদনে কী কী থাকা আবশ্যিক বলে তুমি মনে করো?

____

____

____

____

____

____

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রচারমাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত বিবরণীকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে। যিনি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন, তাঁকে প্রতিবেদক বলে। প্রতিবেদককে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং ঘটনার পক্ষপাতহীন বিবরণ তৈরি করতে হয়।

সংবাদ প্রতিবেদনের শুরুতে একটি শিরোনাম থাকে। এরপর প্রতিবেদকের নাম, ঘটনার স্থান ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

৩.১.৩ সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করি

নিচে কিছু বিষয় দেওয়া হলো। এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো বিষয়ের উপর ১৫০-২০০ শব্দের একটি প্রতিবেদন তৈরি করে 'আমার বাংলা খাতা'য় লেখো। লেখা হয়ে গেলে শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করো।

- বই উৎসব
- স্কুলে বিজ্ঞান মেলা
- বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা
- জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন
- বিদ্যালয় লাইব্রেরির অবস্থা
- বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
- সড়কের বেহাল দশা
- শীতকালীন সবজির বাজার

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক রচনা

৩.২.১ বিবরণমূলক রচনার বৈচিত্র্য

নানা ধরনের বিবরণমূলক রচনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। একেক ধরনের রচনায় একেক ধরনের বিবরণ থাকে। কোন ধরনের রচনায় কী ধরনের বিবরণ প্রত্যাশা করা হয়, তার একটি তালিকা করো। প্রথমটি তৈরি করে দেওয়া হলো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

বিবরণমূলক রচনার ধরন	কী ধরনের বিবরণ থাকে
ছবির বিবরণ	ছবির বিষয় কী? ছবিটির বক্তব্য কী? ছবিতে কী কী আছে? ছবিটি সম্পর্কে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া কী?
ঘটনার বিবরণ	
স্থানের বিবরণ	
স্থাপনার বিবরণ	
প্রাণীর বিবরণ	
বস্তুর বিবরণ	
ভ্রমণের বিবরণ	
অতীতকালের বিবরণ	

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) একজন ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত একটি বইয়ের নাম 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা', 'ভাষা ও সাহিত্য' ইত্যাদি। নিচের লেখাটি লেখকের 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' গ্রন্থের অংশবিশেষ। এ রচনাটি লেখকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণ।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন

মুহম্মদ আবদুল হাই

প্রায় সাত মাস হলো এখানে এসেছি। সাত মাসে দিন গুনে দিন কুড়ির বেশি সূর্যের আলো দেখেছি বলে মনে হয় না। সকাল বেলায় যদিও সূর্য ওঠে, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাতাসের বেগ প্রবল হয়, ঠান্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াতে বেড়াতে জমাট বাঁধে। আকাশ আঁধার হয়ে আসে; ধোঁয়ায়, কুয়াশায় আর মেঘের অন্ধকারে সারা লন্ডন দিনের বেলাটায় ধোঁয়াটে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি যে পরিষ্কার সূর্যের দেশের লোক, আমার দেশে সকালে সূর্য ওঠে, সারাদিন প্রখর কিরণ ছড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়—পরিষ্কার আলোকিত দিনে মন যে সেখানে প্রফুল্ল থাকে, এই সাত মাস ইংল্যান্ডে বাস করে সে কথা ভুলেই যেতে বসেছি।

এই মেঘ, এই ধোঁয়া, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই কনকনে হাড় ভেদ করা শীত—সবই এ দেশের মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই দিনের বেলাকার গোড়ার দিকে হঠাৎ যখন এরা সূর্যের মুখ দেখে, স্নিগ্ধ রোদে চারিদিক যখন ঝলমল করে ওঠে, তখন এদের চোখেমুখে আনন্দের জ্যোতি উপচে পড়ে। পরিচিতে পরিচিতে তো কথাই নেই—অপরিচিতও অপরিচিতকে পথ চলতে গিয়ে মনের আনন্দের ভাগ দেওয়া নেওয়ার জন্য ডেকে বলে—'কেমন সুন্দর দিনটা, না? হাউ লাভলি'। তার অনুগামী কি সহগামী তার আনন্দ ভাগ করে ভোগ করবার জন্যে ঠিক তেমনি ভাষায় সাড়া দেয়। কিন্তু আলাপ এদেশে বেশি জমে না। ওয়েদার-ই এদের আলাপের পুঁজি। সুতরাং পুঁজি ফুরোলেই চুপ করে যায়।

এরা যেমন চুপ করে থাকতে, আপনার মধ্যে ডুব মেরে থাকতে ভালোবাসে, তেমনি সামান্য কিছু একটা অবলম্বন পেলে প্রাণ খুলে হাসতেও জানে। যে হাসতে জানে, দেখা যায় সে বাঁচতেও জানে। হাসির লহরিতে সব ধুয়ে মুছে যায়। ইংরেজের জাতীয় চরিত্র বড্ড পাক-খাওয়া, কূটবুদ্ধির জন্যে এদের নাম আছে। আর ডিপ্লোমেসির জোরেই এরা এতকাল ধরে দুনিয়াতে প্রভুত্ব করে এলো। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ইংরেজ বড়ো কষ্টসহিষ্ণু জাতও। চারিদিকের সাগরের মধ্যে অবস্থিত ইংল্যান্ড একটি দ্বীপবিশেষ। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মতো উঁচু আর তার পরেই সমতল ভূমির মতো নিচু।

এদের দেশে খাদ্যশস্য বড়ো বেশি ফলে না, যা ফলে তাতে এদের কুলোয় না, তাই বিদেশের দিকে সব কিছুর জন্যেই এদের চেয়ে থাকতে হয়। কিছুদিন থেকে দেখছি গোশত একেবারে উধাও হয়ে গেছে। আর্জেনটিনা, অস্ট্রেলিয়া থেকে এরা মাংস আমদানি করে। আমাদের মতো টাটকা মাংস এরা খেতে পায় না। বিদেশ থেকে তিন চার মাস আগের জবাই করা গোরু, ভেড়া, শুয়োর, খরগোশ জাহাজ বোঝাই করে এদেশে আসে। এরা অতি আদরে সেগুলো দোকানে দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। আর মাথাপিছু রেশনে সামান্য একটু যা পায় তাই নিয়ে অতি আনন্দে খায়। দুধ ও দুধজাত জিনিস আসে নিউজিল্যান্ড থেকে। ভিন্ন দেশের জিনিসপত্র না হলে এদের আদৌ চলে না। তাই বলে কি এরা এদের দেশকে কম ভালোবাসে? কত কবি যে এদের আপন দেশের প্রশংসায় মুখর হলেন তা বলে শেষ করা যায় না। এদের দেশ সত্যি ভারি সুন্দর। বৃহত্তম নগরী লন্ডন আর অসংখ্য সাজানো ছোটো গ্রাম আর উঁচুনিচু দিগন্তবিস্তৃত মাঠ নিয়ে সাগরের মাঝখানে গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ড দ্বীপ। শেক্সপিয়ার তাঁর দেশকে তাই বলেছেন—রুপালি সমুদ্রের মাঝখানে যেন অমূল্য মণির মতো বসানো রয়েছে এই দেশ ইংল্যান্ড।

এদের প্রকৃতির এই রুদ্র-কঠোরতার কথা যত ভাবি ততই মনে হয় এ জাতটা বড্ড কষ্টসহিষ্ণু আর তেমনি সংগ্রামশীল। রুদ্র প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদেরকে বাঁচতে হয়। তাই মনে হয় কাজের চাপে এরা যেমন অকারণ কথা বলে দুদণ্ড সময় নষ্ট করার সুযোগ পায় না, আলাপ জমানোটা এরা যেমন ভুলেই গেছে, তেমনি কাজের বোঝা হালকা করে নেবার জন্যে এরা মুখ খুলে হাসতেও শিখেছে। হাসতে পারা যে কত বড়ো কলা তা বোঝা যায় এদের দৈনন্দিন ব্যাবহারের খুঁটিনাটিতে। এদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলায়, সিনেমা-থিয়েটারে, প্যান্টোমাইম কি ব্যালেতে যত না দেখি গম্ভীরভাবে জীবনকে গড়ে তোলার তাগিদ, তার বেশি দেখা যায় হাসির মারপ্যাঁচ। ঘরভরা লোক কথায় কথায় হেসে যাচ্ছে। কোনো গোলমাল নেই—হৈ চৈ নেই। বিরাট জনতার প্রাণখোলা হাসির হররায় সমস্তটা ঘর যেন গমগম করছে। দোকানপাটে যাও—বিশেষ করে ছেলেপুলেদের বিভাগে গেলে দেখা যাবে ছেলেমেয়েদের হাসানোর জন্য কত রকমের খেলনার আয়োজন করে রাখা হয়েছে। এমনভাবে এলিস ইন দি ওয়ান্ডার ল্যান্ড, হামটি ডামটি, পিটার পান্ডা, হিফটি টিফটি প্রভৃতির গল্প বা ছড়াকে আকার দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দোকানে ঢুকলেই মনে হয় যেন আপনা থেকে কাতুকাতু লাগছে। হাসির আবহাওয়াটাই ছোঁয়াচে।

লন্ডনের বিরাটত্বই মনকে ঘাবড়ে দেয়। পথে বেরোলে মনে হয় যেন নিজকে হারিয়ে ফেলছি। ফুটপাথে অগণিত জনতার ভিড় আর পথ দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো যানবাহন—সেই কোচ, ট্রাক, টিউব-বাস-ট্যাক্সি। তবু ভাগ্য ভালো—যানবাহনের ধাক্কায় জনস্রোত চাপা পড়ে না। তাদের পথ সুনির্দিষ্ট। শৃঙ্খলা প্রশংসাতীতভাবে সুন্দর। একটা পথের কিছু দূর যেতে না যেতেই জনতা যেন ডান বামের পথে কেটে পড়তে পারে তার সুবন্দোবস্ত আছে। মোড় ঘুরবার সময় তো বটেই, তার আগেই গাড়িগুলো চলতে চলতে পথের মাঝে প্রয়োজনমতো যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় আর স্তব্ধগতি গাড়ির সামনে দিয়ে অপেক্ষমাণ জনতা যেন মোড় ঘুরে যায়, সেজন্য রাস্তার মাঝে মাঝে যেমন স্ট্যান্ড থেকে প্রতি দুমিনিট অন্তর লাল হলুদ ও সবুজ বাতি জ্বলে উঠছে, তেমনি পথের বুকে খাঁজ-কাটা জায়গা দিয়েই যেন তারা এক পথ ডিঙিয়ে আর এক পথে যেতে পারে তার সুন্দর নিদর্শনও আছে।

লাল বাতি জ্বলে উঠলে গাড়িগুলোকে সেখানে অবশ্যই দাঁড়াতে হয়। সবুজ বাতি জ্বললে তারা চলার নির্দেশ পায়। লাল ও সবুজের মধ্যে রং বদলানোর জন্য হলুদ বাতি ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে। এদের শৃঙ্খলা যেমন পথে পথে, তেমনি বাড়িঘরে আর সবার ওপরে পথচারী মানুষের মধ্যে। ছককাটা স্কোয়ারের মধ্যে বাড়িঘর আর তার চারপাশ দিয়ে রাস্তা। সবই ছবির মতন। এক রকমের পথ। পথের ধারে এক রকমেরই বাড়ি—দালানের পর দালান একইসঙ্গে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লন্ডন অতি প্রাচীন শহর। পুরানো ইতিহাসের বয়সের চিহ্ন গায়ে মেখে আর ফ্যাক্টরির ধোঁয়ায় লন্ডনের বাড়িঘরগুলোর রং কালো হয়ে গেছে।

শীতের দেশ। এ কারণে এদের বাড়িঘরগুলোতে বারান্দা নেই, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা হাওয়া উপভোগ করে আমাদের দেশের মতো ঘুমে ঢলে পড়বার কোনো অয়োজনও নেই। ঘরের কোনো সৌন্দর্য আছে কি না বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। আয়োজন ও সাজসজ্জা সবই ঘরের ভেতরে। এদের রুচি কতো মার্জিত এবং শীত থেকে বাঁচবার জন্যে এদের দরিদ্রতম মানুষও প্রয়োজনের তাড়নায় কীভাবে যে ঘর সাজায় তা এখানে এসে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। ঘরের ভেতরের দেয়ালগুলো সুন্দর মসৃণ ওয়ালপেপার দিয়ে মোড়া। মেঝেতে অবস্থা ও রুচিভেদে দামি কার্পেট পাতা।

ঘরের জানালাগুলো কাচের। সে কাচও পুরু এবং খুব বড়ো। শীতের ভয়ে জানলা কালেভদ্রে খোলা হয়। খুললেও মানুষ যখন ঘরে না থাকে তখনই জানালা খোলা হয় অক্সিজেন নেবার জন্যে। কাচের জানালার সঙ্গে রুচিমতো পর্দা দেখা যাবে সব বাড়িতেই ঝুলছে।

লন্ডনের বাড়িঘরের সব চাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তার মাটির নিচেকার ঘর। লন্ডনের প্রতি বিন্দু মাটিকে এখানকার লোকেরা কাজে লাগিয়েছে। সব কিছুতেই মাপজোখ করা পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়।

সমস্ত লন্ডন শহরের মাটির নিচে আছে আর একটি জগৎ। সে জগৎ তার টিউবরেলের জগৎ। সেটা যেমন তার মায়াপুরী তেমনি লন্ডনের অধিকাংশ বাড়ির নিচে আছে দু-এক তলা ঘর। মাটির নিচে ঘর নেই এমন বাড়ি তো আজও চোখে পড়ল না। এ জন্যেই মাটির সঙ্গে লাগানো তলাটিকে এরা ফার্স্ট ফ্লোর বলে না—বলে গ্রাউন্ড ফ্লোর। আমাদের যেটা দোতলা সেটা এদের ভাষায় ফার্স্ট ফ্লোর। মাটির নিচে বেজমেন্টে কমপক্ষে একটা তলা এদের থাকেই। ল্যান্ডলেডিরা সাধারণত বেজমেন্টে বাস করে। বেজমেন্টের ঘর থেকে যেমন সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরগুলোয় আসা যায়, তেমনি বাড়ির বাইরেও বের হওয়া যায়। বাইরের জগতের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের দৈনিক

জীবনের কারবার হয় এ পথে। আমাদের দেশের লোক হঠাৎ এসে যদি বেজমেন্টের ঘরেরই প্রথম সাক্ষাৎ পায় তাহলে তার মনে প্রশ্ন জাগবে মাটির নিচে মানুষ কী করে জীবন কাটায়। এতদিন পরেও আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই, মুক্ত বাতাস থেকে এরা নিজেদের কীভাবে আড়াল করে রেখেছে। হলোই না হয় শীতের দেশ।

এদের বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরির মধ্যে যেমন একটা পরিণত পরিকল্পনার ছাপ আছে, তেমনি সময়মতো মুক্ত হাওয়া খেয়ে আসার জন্যও শহরের মাঝে মাঝে এরা পার্ক তৈরি করে রেখেছে। পার্কগুলো শহরের প্রাসাদ-সমুদ্রের মধ্যে ছোটো ছোটো সবুজ সুন্দর দ্বীপের মতো। বদ্ধ ঘর ও কর্মশালা থেকে বেরিয়ে সারাটা ইংরেজ জাত এই পার্কগুলোতে প্রাণ ভরে মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে। এজন্যেই শহরের মহল্লার মাঝে মাঝে এমনিভাবে এত পার্ক লন্ডনের বুকের মাঝে সবুজের মোহ ছড়িয়ে নগরবাসীদের হাতছানি দিচ্ছে।

লন্ডন শহরকে নানা অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা অংশকে বোরো বলা হয়। আমাদের যেমন মিউনিসিপ্যালিটি, এখানে তেমনি বোরো। প্রত্যেকটি বোরোতেই অনেক পার্ক আছে। পার্কে দেখা যায় নানা রকমের গাছ, ফুলের বাগান, আর সবুজ ঘাস। এ সবের পেছনে প্রচুর খরচ করতে হয়। পার্কের কোনো অংশ যেন কেউ নষ্ট না করে কিংবা ঘাসের ওপর দিয়ে যেন না হাঁটে সে জন্যে আইনের সাবধানবাণী ছাপানো রয়েছে। লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো পার্ক হাইডপার্ক, আর সেন্ট জেম্‌স পার্ক। এগুলো এত বড়ো যে, এদের মাঝখানে এসে পৌঁছলে কর্মমুখর কোলাহলরত লন্ডন শহরের আওয়াজও কানে এসে পৌঁছয় না। পার্কগুলোর বাইরে কাজের চাপে সারা লন্ডন গতিভারে ভেঙে পড়েছে অথচ এদের ভেতরে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি। বাঁধনের মাঝে মুক্তি পাবার অনুরূপ আয়োজন বটে।

শীতে সারা লন্ডনের গাছপালা নেড়া হয়ে গিয়েছিল। পাতা নেই অথচ ডালপালা মাথায় করে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, এ যেমন দেখতে ইচ্ছে করে না, তেমনি অদ্ভুত লাগে। বসন্তকালে এসব নেড়া গাছে পাতা বেরিয়ে সবুজে সবুজে নাকি কোলাকুলি করবে। হয়তো বা হতেও পারে। তার প্রস্তুতি চলছে এখন থেকে। সেই প্রতীক্ষায় আমি চেয়ে থাকলাম।

শব্দের অর্থ

অ্যাটেনশনের ভঙ্গি: সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি।

কলা: শিল্প।

কালেভদ্রে: কখনো-সখনো।

জনস্রোত: জনতার ভিড়।

টিউবরেল: লন্ডন শহরের রেল-ব্যবস্থা।

ডিপ্লোমেসি: কূটনীতি; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরির কৌশল।

প্যান্টোমাইম: মূকাভিনয়।

বেজমেন্ট: দালানের মাটির নিচের তলা।

বোরো: পৌরসভার অংশ।

ব্যালে: বিশেষ ধরনের নাচ।

মিউনিসিপ্যালিটি: পৌরসভা।

রেশন: বরাদ্দকৃত খাদ্যপণ্য।

৩.২.২ পড়ে কী বুঝলাম

'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. লন্ডন শহরে কী কী বৈশিষ্ট্য লেখকের ভালো লেগেছে এবং কী কী বৈশিষ্ট্য খারাপ লেগেছে?

খ. ইংরেজ জাতিকে লেখক কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন?

গ. লন্ডনের আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে তোমার এলাকার আবহাওয়া ও পরিবেশের তুলনা করো।

৩.২.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. ডিপ্লোমেসির জোরেই এরা এতকাল ধরে দুনিয়াতে প্রভুত্ব করে এলো।	শুধু ডিপ্লোমেসি নয়, দুনিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
২.	
৩.	

৩.২.৪ বিবরণমূলক রচনার ধরন

'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' কোন ধরনের বিবরণমূলক রচনা এবং কেন? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

বিবরণমূলক রচনা

স্থান, বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, অনুভূতি, ঘটনা, ভ্রমণ, অতীতস্মৃতি, ছবি বা কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয় যে রচনায়, তাকে বিবরণমূলক লেখা বলে। বিবরণমূলক লেখায় লেখকের চিন্তা, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনাটি লেখক তাঁর বাস্তব ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লিখেছেন।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কোনো কিছুর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটান। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ে পাঠককে প্রভাবিত করতে পারে। নিবিড় পাঠ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠকও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারেন। যেমন, 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনায় লেখক বলেছেন: 'কাজের চাপে এরা অকারণ কথা বলে দুদণ্ড সময় নষ্ট করার সুযোগ পায় না'। এ ধরনের বাক্যের মধ্য দিয়ে লেখক কর্মনিষ্ঠাকে প্রশংসিতভাবে উপস্থাপন করেন এবং পাঠককে কর্মনিষ্ঠ হতে উৎসাহী করতে চান। আবার, আরেক জায়গায় লিখেছেন: 'আমাদের মতো টাটকা মাংস এরা খেতে পায় না।' এর মধ্য দিয়ে পাঠক বুঝতে পারেন, লেখক টাটকা মাংস পছন্দ করেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক রচনা

৩.৩.১ তথ্যমূলক রচনার বৈচিত্র্য

নিচে তথ্যমূলক রচনার তিনটি শ্রেণি দেখানো হলো। কোন শ্রেণির তথ্যমূলক রচনার জন্য কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তা তৃতীয় কলামে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

তথ্যমূলক রচনার শ্রেণি	রচনার বৈশিষ্ট্য	কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়
লাইব্রেরি-ভিত্তিক	লাইব্রেরিতে সঞ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যেসব তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়।	
পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক	সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যেসব তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়।	
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক	নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যেসব তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়।	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮) একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে আছে 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' ইত্যাদি। নিচে আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখা একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা দেওয়া হলো। রচনাটি 'আত্মস্মৃতি' বইয়ের অংশবিশেষ।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

আত্মস্মৃতি

আবু জাফর শামসুদ্দীন

আমার গ্রাম আমাকে আজীবন আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ চিরহরিতের দেশ। তবু মনে হয়, আমার গ্রামের গাছপালা লতাপাতার মধ্যে কোথায় যেন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।

ভাওয়াল পরগনায় অবস্থিত আমাদের গ্রামটি বর্ষাকালে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, পশ্চিম ভাগটি হয়ে যায় একটি বিচ্ছিন্ন ছোটো দ্বীপ। পশ্চিম অংশেই আমাদের ভিটেবাড়ি। গ্রামের পশ্চিমে বিশাল মাঠ। বর্ষায় বিরাট বেলাই বিলের সঙ্গে মিশে যায়। বেলাই বিল প্রকৃতপক্ষে একটি মস্ত বড়ো হাওড়—শীতকালে বোরো ধান হয়।

মাঠের সর্বত্র বৈশাখ মাসে কয়েক বছর আগেও কালা আমন, ধলা আমন, খামার বাজাল, কার্তিক শাইল প্রভৃতি ধান ছিটিয়ে বোনা হতো। পানি বৃদ্ধি পায়। ছিটিয়ে বোনা ধানগাছও লম্বা হয়। আষাঢ় মাসে বন্যার জলের সঙ্গে প্রবেশ করে শৈল, গজাল, বোয়াল, রুই, কাতল প্রভৃতি মাছ। কোচ, জুইতা প্রভৃতি অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক। কোন্দা এবং ডিঙি নৌকায় মাঠ ছেয়ে যায়। কাঁচা ধানের সবুজ শিষ নাড়িয়ে মাছ দৌড়োয়। কোচ, জুইতার ঘাইয়ে বিদ্ধ করে শিকারি।

ভাওয়াল পরগনার বর্ষাকালটা সত্য সত্যই চমৎকার। প্লাবিত মাঠের মধ্যে মধ্যে ছোটো ছোটো দ্বীপসদৃশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রাম। মাইলের পর মাইল সবুজ ধানের শিষ। মধ্যে মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল গাছঘেরা চিরহরিৎ পল্লি। পশ্চিমের হরিৎ মাঠ আমাকে মুগ্ধ করত। কেবলই মনে হতো, ঐ সবুজ মাঠটা যদি পাড়ি দিতে পারতাম। না জানি কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওপারের ভাসমান গ্রামগুলোতে। বেলাই বিলের ওপর দিয়ে শীতে শীর্ণ বালু নদী প্রবহমান। তার পশ্চিম তীরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে পুবাইলের হাট বসে। আমাদের গ্রাম হতে ছ-সাত মাইলের পথ। বর্ষায় নদী ও বেলাই একাকার হয়ে যায়। ভাওয়াল পরগনার নানা স্থান হতে তরিতরকারি, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, পাট, ধান প্রভৃতি বোঝাই ছোটো বড়ো শত শত নৌকো বেলা ওঠার আগেই এসে উপস্থিত হয় পুবাইলের ঘাটে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ হতে যায় বড়ো বড়ো কঞ্জুরার নৌকো। নৌকোয় নৌকোয় কেনাবেচা। সে এক এলাহি কাণ্ড। আমার গ্রামের ফড়ে বেপারিরা সন্ধ্যারাত্রেই নৌকো বোঝাই করত। কেনাবেচা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসত অনেক রাত্রে। আমার মনে হতো সার্থক জীবন ঐ হাটুরেদের।

ছইহীন ডিঙি নৌকোয় চড়ে পুবাইলের হাটে যাওয়ার বায়না ধরেছি। বাবা ঐ হাটে ক্বচিৎ-কদাচিৎ যেতেন। অন্যদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। বেলাইতে নৌকোডুবি হলে রক্ষা নেই। বেলাই সম্বন্ধে নানা উপকথা প্রচলিত ছিল। আমার দাদি বলতেন, এককালে নাকি বেলাই এবং শীতলক্ষ্যা একাকার ছিল। বাইরা গ্রাম হতে পলাশ পর্যন্ত প্রায় ৮/১০ মাইল ছিল খেয়া নৌকোর পাড়ি। রাজা ছিলেন খাটচা ডোশকা নামক জনৈক আদিবাসী। ঝড়ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বেলাই নাকি রাজপুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনি বোঝাই পানসি নৌকো গ্রাস করেছিল। শোকার্ত রাজার মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। তিনি শপথ করলেন, ডাইনি বেলাইর বুকে কাগা-বগা (কাক ও বক) চরবে, মাছ খাবে। তিনি বেলাইর পানি নিষ্কাশনের জন্য অসংখ্য খাল কাটান। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এসব খাল দিয়ে বেলাইর পানি শীতলক্ষ্যায় নেমে যায়। শীতে সত্য সত্যই বেলাইর বুকে কাক-বকেরা হেঁটে হেঁটে মাছ খায়। সারস, সরাইল, পানকৌড়ি, ছেরছেরি পিপি, কোড়া প্রভৃতি নানা পাখি চড়ে বেড়ায়।

আমাদের গ্রামের নিচে একটি বড়ো বিল। আমার বাল্যকালে এই বিলেও একবার বিশাল আকৃতির বড়ো বড়ো পাখির পাঁচ সাতশোর একটি ঝাঁক নেমেছিল। ওরা ঘণ্টা দুঘণ্টার মধ্যে বিলের বড়ো বড়ো মাছগুলো নিঃশেষে খেয়ে উড়ে গেল। দাদির মুখে শ্রুত এ লোককাহিনিটি আমার মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। বেলাইর উত্তর প্রান্তে রাজাবাড়ি গ্রাম। ভাবতাম ঐ রাজাবাড়িতেই হয়তো ছিল সুদূর অতীতের সেই মহাপ্রতাপশালী রাজা খাটচা ডোশকার রাজধানী।

বেলাই পথে আমার পুবাইলের হাটে যাওয়া হয় আরো অনেক পরে। তখন আমার বয়স দশ-বারো এবং বাবা আমাকে বিলে বন্যার জলে সাঁতার শিখিয়ে ফেলেছেন। ভিটেবাড়ির নিচেই ঢালুতে পাটক্ষেত। আষাঢ়ে পাট কাটা হয়। শ্রাবণে অথৈ পানি। ঐ পানিতেই আমি আর আমার ছোটো দুভাই সাঁতার শিখেছিলাম। গোসলের আগে বাবা ঘণ্টা দুঘণ্টা মসজিদের ঠান্ডা মেঝেয় অথবা বাংলা ঘরের তক্তপোশে ঘুমোতেন। ঐ সময়টায় আমি

ছিলাম ফ্রি। পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে বিলে নামতাম। ঘণ্টা দুঘণ্টা ঝাঁপুড়ি খেলা চলত। মনে পড়ে একদিন ধরা পড়েছিলাম। সময় ব্যাপারে হুঁশ ছিল না। তখন প্রায় একটা বাজে। ঘুম হতে জেগে আমাকে না পেয়ে বাবা কঞ্চির লাঠি হাতে খুঁজতে বের হন। বাড়ির দক্ষিণ-পুবের এক বিলে আমাকে পাওয়া গেল। তাকে বিলের যে পাড়ে দেখা গেল আমি সে পাড়ে উঠলাম না। অন্য পাড় দিয়ে উঠে এক দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে দাদির আশ্রয় নিলাম।

দাদির বয়স তখন একশো কিন্তু তখনও তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ। মেরুদণ্ড ঠিক। বাবা তাঁকে আম্মা সাব ডাকতেন। মায়ের কথার পৃষ্ঠে কথা তিনি কখনো বলতেন না। বাবা ছিলেন দাদির একমাত্র পুত্রসন্তান। তাঁর নয় বছরের ছোটো ছিলেন আমার ফুপু—ব্যাস এই দুজন। হাটবাজারে এবং ঢাকা যাওয়ার সময়, বাবা দাদিকে জিজ্ঞাসা করতেন, আম্মা সাব আপনার জন্য কী আনব? দাদির ফরমাশ ছিল এগুলো: পান, মজালো সুপারি, এলাচি, দারুচিনি, গুয়ামৌরি, যষ্টিমধু, মগাই খয়ের, মতিহারি সাদাপাতা, গুড়, কলা, খিরসা প্রভৃতি। দাদি দুধ-দই ভালোবাসতেন। শিং, মাগুর, শৈল, গজাল, টাকি, বোয়াল, ইত্যাদি মাছ খেতেন না। কবুতর এবং মোরগ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর গোশতও খেতেন না তিনি।

পিতামহ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের ফৌজি বিদ্রোহে ঢাকার দেশি সিপাইরাও যোগ দিয়েছিল। বিদ্রোহ দমনকে উপলক্ষ করে ঢাকা শহরে ব্যাপক গণহত্যা শুরু হয়। শুনেছি লালবাগ কেল্লা এবং তৎসন্নিহিত এলাকা ঘেরাও করে তোপ দাগা হয়। এর ফলে নাকি প্রায় পাঁচ হাজার লোক মারা যায়। মৌলবি মুনশিরা ছিলেন ইংরেজের বিশেষ লক্ষ্য। ওদের পেলেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হতো। আন্ডাঘরের ময়দানে (বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছগুলোতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল অসংখ্য মানুষ। দাদা ঐ সময়ে প্রাণভয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ছাড়ার পর তিনি মসজিদকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বালক-বালিকাদের দিনি এলেম শিক্ষাদানে নিযুক্ত হন।

১৮৫৯-৬০ সালের দিকে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী বেশ কিছুকাল আমাদের বাড়িটিকে তাঁর আস্তানা করেন। দাদা তাঁর শিষ্য হন। দুজনে মিলে আমাদের অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। বিদ্যাশিক্ষা দানের বিনিময়ে দাদা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। বাবাও ঐ ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন। আমার বাল্যকালে বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছে পড়তে আসত। বাবার কাছে শুনেছি, দাদার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে নাকি তিনশো কেতাব ছিল। তাঁর মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক হস্তাক্ষরে লিখিত গ্রন্থও ছিল। দু-চারটি আমি নিজেও দেখেছি। বাবার ১৭ বছর বয়সে দাদার মৃত্যু হয়। আত্মীয়স্বজনরা বহু কেতাব নিয়ে যায়। আমার বাল্যকালেও ৭০টি কেতাব ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল আরবি অক্ষরে লিখিত বাংলা কেতাব। ১৯১৯ সালে ১২ ঘণ্টাব্যাপী ভয়াবহ ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমরা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করি। সারারাত ব্যাপী ঝড়বৃষ্টিতে পিতামহের স্মৃতিবিজড়িত কেতাবগুলো প্রায় সবই নষ্ট হয়ে যায়। উর্দু 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থটি পিতামহের লাইব্রেরির একমাত্র নিদর্শনরূপে এখন আমার কাছে আছে।

১৯১৯-২১ সালের কংগ্রেস খেলাফত আন্দোলনের সময়ে আমাদের গ্রামের উত্তর দিকের এক বড়ো চত্বরে এক বিশাল জনসভা হয়। বাবা সেই স্বদেশি জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় জনৈক পাগড়িধারী মুসলিম বক্তার মুখে আমি সর্বপ্রথম জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিষয় এবং ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি শব্দ দুটি শুনি। মনে হয়, উক্ত বক্তা দেওবন্দি আলেম ছিলেন। সেকালে আমাদের অঞ্চলে বহু যুবক পড়াশোনা করতে দেওবন্দ

যেত। মহাত্মা গান্ধী এবং আলী ভাইদের নামে জয়ধ্বনি শুনেছিলাম সেদিনই প্রথম। বন্দে মাতরম এবং আল্লাহু আকবর দুই-ই ছিল সভার স্লোগান। সভাশেষে স্থানীয় কংগ্রেস-কাম-খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। বাবা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। মনে পড়ে, তিনি বাড়িতে চরকা নিয়ে আসেন। দাদি কোম্পানির আমলের মানুষ— সুতো কাটতে জানতেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গ্রামের প্রায় সকলের বাড়িতে চরকা বসল। দাদি অনেককে সুতো কাটতে শিখিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে মুষ্টির ঘটি। প্রতি শুক্রবারে মসজিদে মুষ্টির চাল জমা হতো। সে চাল পৌঁছে দেয়া হতো কেন্দ্রীয় কংগ্রেস খেলাফত অফিসে।

বাবার নিত্যকার পোশাক ছিল সাদা পাঞ্জাবি, সাদা তহবন, সাদা টুপি, চটি জুতো এবং ছাতা। তৎকালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের অধিকাংশ চটি জুতো ব্যবহার করত। হিন্দু মহিলারা জুতো পরত না। মুসলিম মহিলারাও সাধারণত চটি জুতা পরত না-কারও কারও প্যাটেন্ট লেদারের ফুলতোলা রঙিন পাম্পশুও ছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ চাষি পরিবারের মহিলাদের একমাত্র পরিচ্ছদ ছিল পেঁচিয়ে পরা একটি শাড়ি। সারাদিন নগ্নপদে কাজ করার পর রাত্রে পা ধুয়ে কেউ কেউ খড়ম পরত। অনেকের তাও ছিল না। প্রচন্ড শীত পড়লে চাষি পুরুষেরা তাল গাছের ডালার গোড়ার খোল মাপ অনুযায়ী কেটে তার মধ্যে দড়ির বেড় দিয়ে এক ধরনের স্যান্ডেল তৈরি করে নিত। এগুলোকে বলা হতো ‘পাওটি’। অধিকাংশ চাষি পরিবারে শৌচকার্য ও হাত ধোয়ার জন্য মাটির লোটা এবং ভাত খাওয়ার জন্য মাটির সানকি ব্যবহৃত হতো। কলসিও ছিল মাটির। শয্যা ছিল বাঁশ-বেতির দরমা। শীতকালে দরমার নিচে খড়কুটো এবং দরমার ওপরে কাঁথা বিছানো হতো। আমাদের বাড়িতে কেরোসিনের কুপি জ্বলত। ঝড়-বাদলের রাত্রির জন্য একটি ল্যান্টার্নও ছিল। অধিকাংশ লোকের বাড়িতে রুহুইনা গাছের বিচি হতে সংগৃহীত তেলের প্রদীপ জ্বলত। এই প্রদীপের নাম ছিল ‘মুছি’।

আমাদের গ্রামে আট দশটি পরিবারের একটি ব্রাহ্মণপাড়া ছিল। একটি পরিবারের উপাধি ছিল চক্রবর্তী। বাকি সবাই ছিল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ এবং একই গোত্রভুক্ত। অবশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে কয়েক ঘর গোয়ালা ব্যতীত বাকি সবাই ছিল নমঃশূদ্র। নমঃশূদ্রদের তিন চারটি পরিবার কামার, ছুতোর ও করাতির কাজ করত। অন্যেরা ছিল কৃষিজীবী। গোয়ালাদের মধ্যে একটি পরিবারের এবং একটি নমঃশূদ্র পরিবারের বহু জমিজমা ছিল। তালুক স্বত্বেও ছিল ওদের অংশ। সুতরাং রাইয়ত প্রজাও ছিল। ব্রাহ্মণরাও তালুকদার ছিল। খাসখামার জমিও ছিল ওদের। ওরা নিজে চাষবাস করত না, খাসখামার জমি নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষি বর্গা করত। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবারের সুদি কারবার ছিল। অনাদায়ি রেহানি ঋণের দায়ে মুসলমান ও নমঃশূদ্র চাষিদের জোতজমি সুদখোর ব্রাহ্মণ পরিবারগুলোর অধিকারে চলে যাচ্ছিল। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হতো। তিরিশের দশকে ঋণ সালিশি বোর্ড হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সকলের পেশা ছিল স্বহস্তে জমি চাষ অথবা জনমজুরি। বর্ষার অবসরকালটায় কেউ কেউ পাট ও তরিতরকারির কারবার করত। পাটের মৌসুমে একটি পরিবার বাকরখানি রুটি তৈরি করে ফেরি করত। গৃহস্থ গৃহিণীর পাটের বিনিময়ে বাকরখানি রুটি এবং বেদেনিদের কাছ থেকে রেশমি চুড়ি রাখত।

গ্রামে লেখাপড়ার চর্চা বিশেষ একটা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আমার পিতাই মোটামুটি শিক্ষিত লোক। তিনি বাংলা ছাড়াও উর্দু ও ফারসি বলতে পারতেন। আমার মা বাংলা বইপত্র পড়তে পারতেন, কিন্তু লিখতে পারতেন না। আমার ফুপুও বাংলা, উর্দু, ফারসি বলতে ও লিখতে পারতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বাকি

অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। কেউ কেউ কায়ক্লেশে নাম স্বাক্ষর করতে এবং পুথি পড়তে পারত। সমাজে পুথি পড়ুয়াদের বিশেষ সম্মান ছিল। আমির হামজা, সায়ফুল মুলক ও বদিউজ্জামাল, সোনাভান প্রভৃতি পুথি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জ্যোৎস্নালোকিত উঠানে বগুনার ওপর কুপি জ্বালিয়ে পুথির মজলিস বসত। বাবা এসব পছন্দ করতেন না। আমাদের বাড়িতে পুথির মজলিস বসতে কখনো দেখিনি। ধান, পাট, আখের চাষ হতো গ্রামে। শীতকালে আখ ভাঙাবার গাছ আসত। গ্রামের ছেলেরা আখের গাছের জোয়াল ঠেলত। আমিও ঠেলেছি। এই পরিবেশে কেটেছে আমার বাল্যকাল।

শব্দের অর্থ

এন্ট্রান্স: মাধ্যমিক পরীক্ষা।

এলাহি কাণ্ড: বিরাট ঘটনা।

কংগ্রেস: ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক দলের নাম।

করাতি: কাঠ চেরাই করা যার পেশা।

কাতল: কাতলা মাছ।

কামার: লোহা দিয়ে জিনিস বানানো যার পেশা।

কারবার: ব্যবসা।

কায়ক্লেশ: শারীরিক কষ্ট।

কুপি: প্রদীপ।

কেল্লা: দুর্গ।

খড়ম: কাঠের চটিজুতা।

খাসখামার: খাজনামুক্ত জমি।

খেলাফত আন্দোলন: ব্রিটিশ শাসন আমলের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন।

গজাল: গজার মাছ।

চিরহরিৎ: চিরসবুজ।

ছুতোর: কাঠমিস্ত্রি।

জনমজুরি: দিনমজুরি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ: পাঞ্জাবের একটি শহরের নাম।

জুইতা: মাছ ধরার হাতিয়ার।

জ্যোৎস্নালোকিত: জোছনায় আলোকিত।

তক্তপোশ: কাঠের চৌকি।

তৎসন্নিহিত: তার নিকটবর্তী।

তালুকদার: ছোটো জমিদার।

তোপ দাগা: কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা।

দরমা: বাঁশের ফালির তৈরি মাদুর।

নমঃশূদ্র: হিন্দু জাতিবর্ণ বিশেষ।

পুথি: হাতে লেখা প্রাচীন কাব্য।

প্যাটেন্ট: স্বত্বাধিকার।

ফরমাশ: আদেশ।

ফৌজি বিদ্রোহ: সিপাহি বিদ্রোহ।

বগুনা: ধাতুর তৈরি পাত্র।

বাকরখানি: ছোটো আকারের রুটি জাতীয় খাবার।

ব্যুরোক্রেসি: আমলাতন্ত্র।

রাইয়ত: প্রজা।

রুহুইনা গাছ: রয়না গাছ।

শৈল: শোল মাছ।

৩.৩.২ পড়ে কী বুঝলাম

'আত্মস্মৃতি' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. এই রচনায় কোন সময়ের তথ্য পাওয়া যায়?

খ. গ্রামের প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখকের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

গ. এই রচনায় সামাজিক-রাজনৈতিক যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলো উপস্থাপনের সময়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতমূলক, তা আলোচনা করো।

৩.৩.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'আত্মস্মৃতি' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'আত্মস্মৃতি' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. ১৯১৯ সালে ১২ ঘণ্টাব্যাপী ভয়াবহ ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়।	অনলাইনে খোঁজ করে দেখেছি, এই তথ্যটি ঠিক আছে।
২.	
৩.	

৩.৩.৪ তথ্যমূলক রচনার ধরন

‘আত্মস্মৃতি’ শিরোনামের লেখাটিকে কেন অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

____

____

____

____

____

____

____

____

তথ্যমূলক রচনা

তথ্য পরিবেশন করাই যে রচনার মূল লক্ষ্য তাকে তথ্যমূলক রচনা বলে। তথ্যমূলক রচনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যেমন:

১. লাইব্রেরি-ভিত্তিক: লাইব্রেরিতে সঞ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লাইব্রেরি-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়। এ ধরনের তথ্যমূলক রচনা লেখার জন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পত্রপত্রিকা, বই, দলিলপত্র, নথিপত্র, বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু, পুথি, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক: সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়। এ ধরনের তথ্যমূলক রচনা লেখার জন্য সরেজমিনে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জরিপ, সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩. অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক: নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা লেখা হয়। এ ধরনের তথ্যমূলক রচনা লেখার জন্য নিজের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতার স্মৃতি, ডায়েরি, পারিবারিক সংগ্রহ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক রচনা

৩.৪.১ বিশ্লেষণমূলক রচনার উপকরণ

বিশ্লেষণমূলক রচনায় কখনো উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়, কখনো তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। কোনো কোনো বিশ্লেষণমূলক রচনায় একইসঙ্গে উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। নিচে কিছু নমুনা দেওয়া হলো। এর মধ্যে কোনটি উপাত্ত এবং কোনটি তথ্য তা ডান কলামে লেখো। প্রথম দুটি করে দেখানো হলো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

	নমুনা	এটি উপাত্ত/তথ্য
১	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।	উপাত্ত
২	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিন জনই উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।	তথ্য
৩	**স্কুলের নাম** **প্রতিষ্ঠাকাল** ক উচ্চ বিদ্যালয় ১৯২০ খ উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪২ গ উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৬৮ ঘ উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৮২	
৪	এই এলাকার চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে ক উচ্চ বিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীন।	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৫	সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।	
৬	একটি গ্রামে ১৪৩০ জন যুবক, ২৪০ জন বৃদ্ধ এবং ৫৫০ জন শিশু।	
৭	পাঁচ জন শিক্ষার্থীর ওজন ৪৫, ৫৫, ৪৯, ৬১ ও ৫২ কেজি।	
৮	হামিদের চেয়ে সোলেমান বেশি জোরে হাঁটতে পারে।	

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে আছে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, ‘ভাষা আন্দালন: আদি পর্ব’ ইত্যাদি। নিচে ১৯৭৩ সালে রচিত আবদুল হকের একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো। এটি লেখকের ‘সাহিত্য ও স্বাধীনতা’ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা

আবদুল হক

বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হলো ষোলোই ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত এবং উজ্জ্বল দিবসে। কোনো নবজাত রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাই বড়ো ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচনার একটা গুরুত্ব এই যে, ইতিহাসে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হলো। রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়াও এ সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে। আর এই কারণে শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের নয়, ভাষা আন্দোলনেরও শ্রেষ্ঠতম বিজয়স্তম্ভ বাংলাদেশের সংবিধান। বিজয় দিবস, সংবিধান দিবস এবং ভাষা আন্দোলনের একটি বিশেষ পরিণতি লাভ একসঙ্গে মিশে গেল।

বাংলা ভাষার এবং ব্যাপকতম অর্থে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সংবিধান রচনার একটা তাৎপর্য হচ্ছে এই, এটি ভাষার বিশেষ এক গুণগত পরিণতি লাভের উদাহরণ। সংবিধানের কাজ রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কাঠামোকে ধরে রাখা, এমন ভাষায় যার মধ্যে ভাবাবেগ, অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থতা, বাহুল্য অথবা অন্য কোনো প্রকার ত্রুটি এবং শৈথিল্যের অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান যৌথ রাষ্ট্রচিন্তাকে রূপদান করে, যাঁরা সংবিধান রচনায় ব্যাপৃত থাকেন শুধু তাঁদের চিন্তা নয়, সমগ্র জাতির চিন্তাও। সেই সঙ্গে কয়েক শতাব্দীর আন্তর্জাতিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও এর উপর ছায়াপাত করে। যাঁরা সংবিধানের প্রকৃত রচয়িতা এবং জনসমাজের রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাঁরা বাংলা ভাষাবিদগণেরও সহায়তা নিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাঁদের মনে রাখতে

হয়েছে আদালতে এবং ময়দানের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের কথা। প্রতিটি বাক্য এবং শব্দকে সোনার মতো সূক্ষ্মভাবে ওজন ও যাচাই করে দেখতে হয়েছে, সেই সঙ্গে দেখতে হয়েছে যেন সংবিধানের ভাষা বাংলা হয়, শুদ্ধ বাংলা হয় এবং পাঠযোগ্য বাংলা হয়।

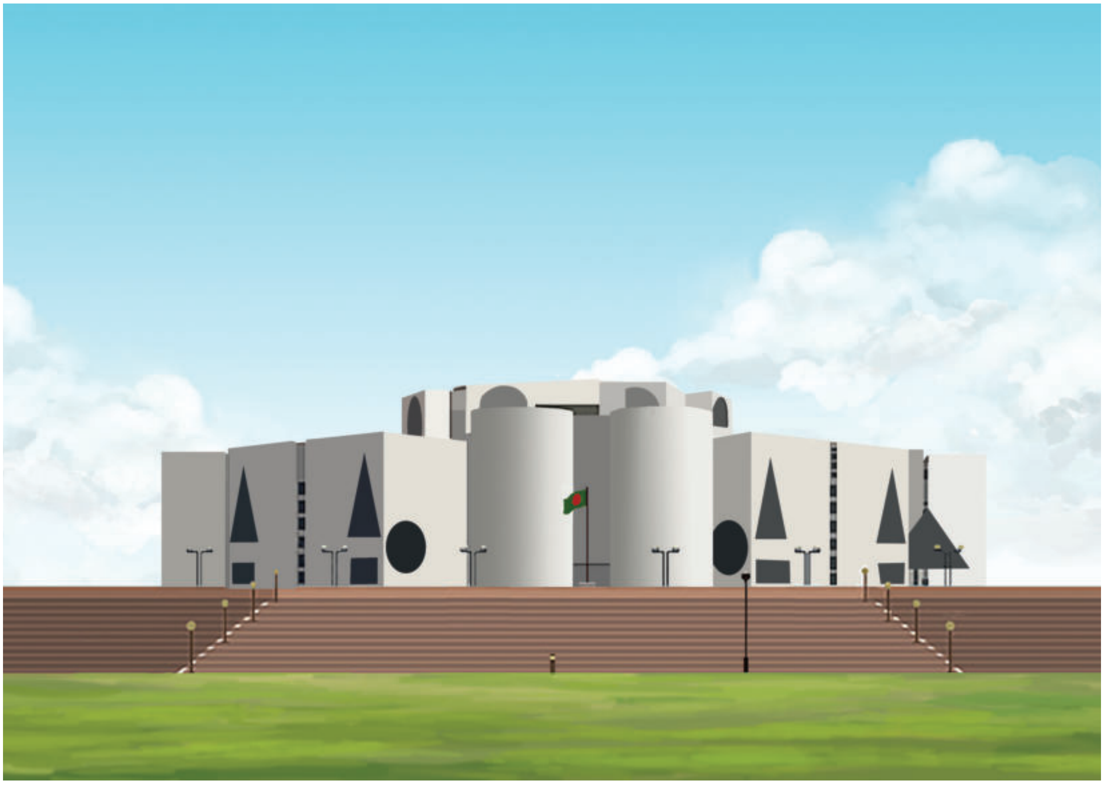

জাতীয় সংসদে, নিশ্চিতভাবে ধরা যায়, এখন থেকে বাংলা ভাষাতেই আইন প্রণীত হবে। প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের অনুরোধ করেছেন বাংলায় মামলার রায় লিখতে। দু-একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলা ভাষায়। এসবই বাংলার জন্য নতুন কাজ। একেবারে আনকোরা কাজ বোধ হয় বলা চলে না, তবে এসব ক্ষেত্রে এমন সর্বাত্মক আত্মনিয়োগের দায়িত্ব আর কখনো ভাষার উপর এসে পড়েনি। এসব কাজে আবেগে, বাহুল্যে, শৈথিল্যে, অস্পষ্টতার ভারে তার নুয়ে পড়ার অবকাশ নেই, নিটোলদেহ কর্মীর মতো তাকে ফিটফাট হয়ে উঠতে হবে। কোনো রকম সাহিত্য সৃষ্টি নয়, বাস্তব কর্মনিপুণতাই হবে তার যোগ্যতার মাপকাঠি।

আরো দুটি ক্ষেত্রে বাক্য ও শব্দকে সবসময়ে ঠিক ঐ রকম সোনার মতো ওজন করার দরকার না হলেও যথেষ্ট কর্মনিপুণ হতে হবে। সেই দুটি ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষা। প্রশাসনের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, সঠিকভাবে বলতে গেলে প্রধান মাধ্যম হবে বাংলা। সব রকমের জ্ঞান ধরে রাখতে হবে এবং ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করতে হবে বাংলা ভাষায়, যে সব দুরূহ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কখনো কিছু লেখা হয়নি সেসব বিষয়েও। শিক্ষণীয় সব বিষয়ের মাধ্যম হবে বাংলা, যদিও বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা বিদেশি পণ্ডিতদের লেখা বই চিরদিন ইংরেজি ভাষায় পড়তে হবে শিক্ষার এবং জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য। শুধু ইংরেজি ভাষায় কেন, সকল উন্নত

ভাষায়। দুরূহ বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাংলা ভাষার আছে, এ পরিচয় উনিশ শতক থেকেই কমবেশি পাওয়া যাচ্ছে।

সংবিধান, আইন এবং মামলার রায়, প্রশাসনিক চিঠিপত্র এবং সরকারি আধা-সরকারি সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিচিত্র প্রকার বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ, যন্ত্রবিদ্যা এবং অন্যান্য বাস্তব কাজের বিষয় সংক্রান্ত প্রকাশনা সাহিত্য নয়, কিন্তু এরা সকলে মিলে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির পটভূমি রচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বাংলাদেশেই এর সম্ভাবনা অধিক প্রশস্ত; কেননা এদেশে সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য যতখানি ইংরেজির প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সবকিছু ধারণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা ভাষাকে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেত্র থেকে শুধু সর্বভারতীয় প্রয়োজনে ইংরেজিকে সরানো যাবে না। এবং অনেক ক্ষেত্রে একই প্রয়োজনে হিন্দিকে জায়গা দিতে হবে, জ্ঞান ও সংস্কৃতির নিজস্ব প্রয়োজনে নয়। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বাংলাদেশেই বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল। অধিকন্তু ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম এবং বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের যে বিপুল অভিজ্ঞতা বাঙালির হয়েছে তাও একটা মহৎ সাহিত্যের রূপ পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনের চাপেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ হতে হবে, হওয়ার সম্ভাবনা অপরিসীম।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অবিচ্ছেদ্য: পৃথক করা যায় না এমন।

আনকোরা: নতুন।

কর্মনিপুণ: কাজে দক্ষ।

চ্যালেঞ্জ: বাধা।

ছায়াপাত: প্রতিফলন।

নবজাত: নতুন জন্মপ্রাপ্ত।

দ্ব্যর্থতা: যার অর্থ দুই রকম।

রাষ্ট্রচিন্তা: রাষ্ট্র সংক্রান্ত চিন্তা।

শৈথিল্য: শিথিলতা।

৩.৪.২ পড়ে কী বুঝলাম

‘বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা’ রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. ১৬ই ডিসেম্বর তারিখটি কোন দুটি কারণে লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

খ. বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনার ব্যাপারটি লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. বাংলাদেশে বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি কেন? তোমার মতামত দাও।

৩.৪.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে উত্তর মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের অনুরোধ করেছেন বাংলায় মামলার রায় লিখতে।	লেখাটি ১৯৭৩ সালের। কিন্তু কথাটি এখনো প্রাসঙ্গিক।
২.	
৩.	

৩.৪.৪ এটি কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা

'বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা' শিরোনামের রচনাটিকে কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

বিশ্লেষণমূলক রচনা

বিশ্লেষণমূলক রচনার উপকরণ দুই ধরনের: উপাত্ত এবং তথ্য।

উপাত্ত বলতে বোঝানো হয় একই ধরনের কিছু পরিমাণগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য, যেগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো থাকতে পারে। যেমন: প্রতিদিন ভোরে হাবিব সাহেব ২ মাইল দৌড়ান, রহমান সাহেব ১ মাইল দৌড়ান এবং জামিল সাহেব ১.৫ মাইল দৌড়ান। এটি পরিমাণগত উপাত্তের উদাহরণ। আবার সেলিম ফুটবল খেলে, আবেদ ক্রিকেট খেলে, সুমন দাবা খেলে, জিসান হাডুডু খেলে। এটি গুণগত উপাত্তের উদাহরণ।

উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন তথ্য তৈরি হয়। এভাবে বিশ্লেষিত তথ্য দিয়ে যে রচনা লেখা হয়, তাকে বিশ্লেষণমূলক রচনা বলে। 'বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা' রচনায় লেখক কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য তৈরি করেছেন। যেমন, পাকিস্তান-পর্বে ভাষা আন্দোলন হয়েছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। এই তিনটি তথ্যের মধ্যে প্রাবন্ধিক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন, 'বিজয় দিবস, সংবিধান দিবস এবং ভাষা আন্দোলনের একটি বিশেষ পরিণতি লাভ এক সঙ্গে মিশে গেল।' তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে। প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণমূলক।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

৩.৫.১ কল্পনানির্ভর রচনার বৈচিত্র্য

নিচে কয়েক ধরনের কল্পনানির্ভর রচনার তালিকা দেওয়া হলো। এসব কল্পনানির্ভর রচনার বৈশিষ্ট্য কী, ডানের কলামে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কল্পনানির্ভর রচনার শ্রেণি	রচনার বৈশিষ্ট্য
রূপকথা	
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি	
রম্যরচনা	

নিচে গোলাম মুরশিদের লেখা একটি কল্পনানির্ভর রচনা দেওয়া হলো। রচনাটি আমেরিকান লেখক লিও বুসকাগলিয়ার (১৯২৪-১৯৯৮) কাহিনির ছায়া অবলম্বনে রচিত।

গোলাম মুরশিদ (জন্ম ১৯৪০) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আশার ছলনে ভুলি', 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' ইত্যাদি।

কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু

গোলাম মুরশিদ

কখন যে বসন্ত চলে গেছে টেরই পাইনি। গরমের সুন্দর হাওয়া গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার জন্ম মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, পাহাড়ের গায়ে। তাই ভারি ভালো লাগছে এই উষ্ণ হাওয়া। আমার নাম কিশলয়। এখনো কিশোর আমি। প্রথম আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম বসন্তের এক ভোরবেলায়। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলাম চারদিকটা। আমার বাসা একটা বড়ো গাছের মগডালে। আমার চারদিকে আমারই মতো শত শত পাতা। তোমরা বোধহয় পাতাগুলোকে ভাবো একই চেহারার। কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো, হুবহু একই চেহারার দুটি পাতা পাবে না তুমি। আমার ধারেই থাকে 'আলো'। আলোর মতোই তার স্বভাবটা হালকা—

খিলখিল করে হাসে। আর ডান পাশে বেণু। পর্ণা থাকে একটু সামনে, ওপরের দিকে।

ছেলেবেলা থেকে আমরা সবাই বাতাসের সঙ্গে গাইতে শিখেছি, নাচতে শিখেছি। রোজ রোদে স্নান করি। কী যে ভালো লাগে! তারপর বিকেল বেলা যখন আলো কমে আসে; আমার মন খারাপ করে তখন। আলো, বেণু, পর্ণা—ওদেরও করে বোধহয়।

মাঝেমধ্যে বৃষ্টি নামে। তার ধারায় স্নান করতে আমার খুব ভালো লাগে। সমস্ত শরীরটা ধুয়ে যায়। সে বৃষ্টিও কি এক রকম! কখনো ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে। কখনো অঝোর ধারায় যেন রাগ করে ঝরতে থাকে। সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সে গর্জন করতে থাকে। তার রাগী চোখের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত আকাশটাকে আলোতে ঝলসে দেয়। কিন্তু একটু পরই যখন তার মেজাজ ভালো হয়, তখন রোদ হেসে ওঠে।

আলোর কথা বলেছি, বেণুর কথা বলেছি, পর্ণার কথাও। কিন্তু এখনো শোনোনি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুর কথা। তার নাম ঋষি। সে অনেক কিছু জানে।

ঋষিই একদিন বলেছিল আমাকে, আমরা নাকি সবাই একটা গাছের অংশ। গাছটা আছে একটা ছোটো গাঁয়ের এক পাশে—একটা বাগানে। গায়ের লোকেরা একে বলে পার্ক। সবুজ ঘাস বিছানো একটা মাঠ আছে সেই বাগানে। চারদিকে অনেক গাছ। নানা ধরনের গাছ। কোনোটার পাতা বড়ো, কোনোটার ছোটো। কারও পাতা বেশ গোল, কারও লম্বাটে। যে গাছে আমার জন্ম তার পাশেই আছে একটা দেবদারু গাছ। লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো পাতা। কিন্তু দূরে আছে একটা মজার গাছ। তার পাতাগুলো খুব সরু আঁশের মতো। যখন তার গায়ে হাওয়া লাগে, তখন শোঁ শোঁ করে সে গান করে। অন্য গাছের পাতারা চুপ করে শোনে। মাঝেমধ্যে তারা ঝরঝর মড়মড় করে তালি দেয়। পাতার মতোই—অনেক গাছে ফল ধরে, আবার অনেক গাছে ফল ধরে না। যে গাছে আমার জন্ম, সে গাছে কোনো ফল ধরে না।

একদিন ঋষি বলেছিল, গাছগুলো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাটির তলায় আছে তাদের শেকড়। লম্বা, মোটা, খুব শক্ত শেকড়। মাটি আঁকড়ে ধরেই গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ গাছের ডালে এসে বসে নানা রকমের পাখি। গাছের ডালেই তারা বাসা বাঁধে। রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু রাত পোয়ানোর আগেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়।

আমি যে একটা পাতা—এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে আমার। ভালো লাগে আশপাশের বন্ধুদের। আর আমি সত্যি ভালোবাসি যে গাছে আমার জন্ম, তাকে। সেই তো আমার মা। তার রস খেয়েই নাকি আমরা বেঁচে আছি—মায়ের দুধের মতো। আমি যে ঘুড়ির মতো আকাশে ভেসে থাকি, হাওয়ার সঙ্গে তালে তালে নাচি—সে কথা ভাবতেই আমার শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে।

এবার গরমের সময়ে অনেকেই বেড়াতে এসেছে এই বাগানে। ছেলেমেয়েরা। বুড়োবুড়িরা। নানা বয়সের অনেক লোক। অনেকে এসে বসেছে আমাদেরই ছায়ায়। ছায়া দিতে আমার ভারি ভালো লাগে। একদিন পর্ণাকে জিগগেস করেছিলাম, সে বলেছিল ছায়া দিতে তারও নাকি খুব ভালো লাগে। ঋষি তো সবই জানে! একদিন সে আমাকে বলেছিল, ছায়া দেওয়া নাকি আমাদের জীবনের একটা লক্ষ্য।

লক্ষ্য? আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম। তারপর ঋষিকে জিগগেস করলাম, 'লক্ষ্য কী?'

ঋষি বলল, 'লক্ষ্য হলো বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য।' তারপর বুঝিয়ে বলল, 'আমরা যে জন্মেছি, আমরা যে বেঁচে আছি, এর কারণ কী? বেঁচে থেকে যদি অন্যদের জীবনটাকে একটু সুখ দিতে পারি, অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তাহলে বাঁচার একটা মানে হয়। তাই না? যেমন ধরো, গরমে বেশ কাতর হয়ে বুড়োবুড়িরা বাড়ি থেকে বাগানে আসে হাওয়া খেতে, শরীরটা জুড়াতে, একটু বিশ্রাম করতে, তখন আমরা ছায়া দিলে তাদের ভালো লাগে। নয়তো তারা কোথায় বসবে, বলো? বাচ্চারা খেলতে আসে এই পার্কে। তারা কি গরম রোদের মধ্যে খেলবে? আমাদের ছায়ায় খেলে, তাই না? রোজ বাড়িতে খায় সবাই। একদিন একটু ফুর্তি করার জন্য খাবারদাবার নিয়ে বাগানে আসে। বনভোজন করতে। আসে ছেলেমেয়ে নিয়ে। চেয়ে দেখো, কেউ এসে মাঠের মধ্যিখানে বসে না। বসে মাঠের ধারে, গাছের তলায়। কারণ, সেখানটাই একটু ঠান্ডা। এভাবে সবার কাজে লাগতে পারলে জীবনের একটা মানে হয়। তাই না?' একসঙ্গে অনেক কথা বলে ঋষি চুপ করল।

যারা বেড়াতে আসে তাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসি বুড়োবুড়িদের। আর বাচ্চাদের। বুড়োবুড়িরা ঠান্ডা ছায়ায় কেমন চুপচাপ বসে থাকে। বেশি নড়াচড়া করে না। কথা বলে আস্তে আস্তে—যেন ফিসফিস করে!

ছোট ছেলেমেয়েদেরও আমি পছন্দ করি। কিন্তু তারা একটু দুরন্ত হয়। কেউ কেউ আমার মা-গাছকে আঘাত করে। কেউ কেউ গাছের বাঁকলে নিজেদের নাম লেখে। কেউ আবার আমাদেরই ছিঁড়ে নেয়। আমার সাথিদের ছিঁড়তে দেখে আমার কষ্ট হয়, বেচারাদের জন্য কান্না পায়। কিন্তু তবু ছোটদের হৈচৈ করে খেলতে দেখে আমার ভালো লাগে। সেদিন দুটো ছেলেমেয়ে এসেছিল তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে। কী মিষ্টি চেহারা তাদের!

এভাবে দেখতে দেখতে গরমের সময়টা আমার চলে গেল।

তারপর এলো হেমন্ত। কার্তিকের রাতে কেমন শীত শীত করতে শুরু করল। অঘ্রানের শুরুতে এক রাতে সত্যি খুব ঠান্ডা লাগল। রাতের বেলা শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম। মনে হচ্ছিল শরীরটা কে যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে। পরের দিন ভোরের আলোতে দেখলাম, আমার গায়ে কী যেন সাদা সাদা লেগে আছে। অন্যদের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাদের গাও সাদা সাদা। ঋষিকে জিগগেস করলাম, 'এটা কী, ভাই?' সে বলল, 'রাতের বেলা হিম পড়েছিল।' 'হিম? হিম কী?' আমি আবার জিগগেস করলাম। সে বুঝিয়ে বলল—বেশি ঠান্ডা পড়লে বাতাসে যে বাষ্প থাকে, তা-ই জমে গিয়ে নাকি হিম পড়ে। 'বুঝলে, কিশলয়! হিম থেকে বোঝা যাচ্ছে শীতকাল এসে গেছে। দেখবে কী রকম শীত পড়ে। আর চারদিকটাই ঢেকে যাবে সাদা বরফে। মনে হবে যেন কে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে!' ঋষি বলল, সবজান্তার মতো।

হিম পড়ার পর কদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখলাম। কেমন যেন মনে হলো। মনে হলো সমস্ত বাগানটার রং বদলে যাচ্ছে। হয়তো আগে থেকেই রং বদল শুরু হয়েছে। কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। অল্প দিন আগেও চারদিকটা কেমন সবুজে ছেয়ে ছিল। মনে হতো যেন সবুজের বান ডেকেছে বাগানে, মাঠে, গাছগুলোর ওধারের দিঘিতে, এমনকি আকাশের কানায় কানায়। সেই সবুজ যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে

যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। তার বদলে এ কী রঙের খেলা শুরু হলো পাতায় পাতায়!

মনে হলো, সমস্ত পার্কে রঙের আগুন লেগেছে। আমার বন্ধু আলোর দিকে চেয়ে দেখলাম, তাকে চেনা যাচ্ছে না। সবুজের বদলে তার রং হয়েছে গাঢ় হলুদ। বেণুর রং হয়েছে আরও বাহারে! উজ্জ্বল কমলা রং। পর্ণার গায়ে যেন আবির মেখে লালের আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কখন যে আমিও হলুদ আর কমলা মেশানো একটা অদ্ভুত রঙে নেয়ে উঠেছি খেয়ালই করিনি। ভাবলাম, কোনো এক অজানা জাদুতে সবারই রং পাল্টে গেছে। ঋষি! ঋষির রংটা দেখতে হয়! দেখলাম, তার গায়ে লেগেছে বেগুনির ছাপ। আশ্চর্য! মনে হলো আমরা সবাই মিলে আকাশের রংধনুর রঙে স্নান করে উঠেছি।

আমরা তো সবাই একই মায়ের সন্তান! তা হলে এমন বিচিত্র রং হলো কেন আমাদের? ঋষিকেই জিগগেস করলাম। সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল: 'হ্যাঁ, আমরা একই গাছের পাতা। কিন্তু আমরা সবাই আলাদা। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও আলাদা। সূর্যের আলো আমাদের ওপরে পড়েছে এক-একভাবে। ছায়া পড়েছে এক-এক রকম। তা হলে বলো, আমাদের রং এক-এক রকম হবে না কেন!' ঋষি আবার বলল, 'জানো, এই রঙের মরসুমকে কী বলে? একে বলে হেমন্ত। ঝরে যাওয়ার কাল!' ঋষির কথা শুনে কী এক অজানা ভয়ে মনটা দুলে উঠল।

এরই মধ্যে একদিন ভারি অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। সেই ছেলেবেলা থেকে হাওয়ার সঙ্গে নেচে নেচে বড়ো হয়েছি। হাওয়াকে চিরদিন দেখেছি, কী প্রসন্ন। রাগ দেখিনি কখনো। তাকে ডেকেছি মিতা বলে! সেই হাওয়াই একদিন এলো কী প্রচণ্ড রাগী চেহারায়! এত দিন তার ঘাড়ে চড়ে খেলেছি। আজ মনে হলো, বোঁটা থেকে সে আমাদের ছিঁড়ে নেবে। আছাড় দিয়ে ছুড়ে ফেলবে। সত্যি সত্যি বাতাসের তোড়ে কেউ কেউ ছিঁড়ে গেল গাছের ডাল থেকে। কেউ বা কোথায় উড়ে গেল তার খবরও জানি না। একটা ডাল ভেঙে গেল পাশের গাছটার। সত্যি আমরা পাতারা সবাই ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকলাম। আমরা একে অন্যকে ফিসফিস করে জিগগেস করলাম, 'এটা কী হচ্ছে?'

সবজান্তা ঋষি উত্তর দিল। বলল, 'তোমরা জানো না, কিন্তু হেমন্তের প্রথম দিকে এটা হয়েই থাকে। এ হলো পাতাদের বাসা বদলের সময়। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় চলে যাওয়ার সময়। লোকেরা একে বলে মরে যাওয়া, এক কথায় মৃত্যু।'

আমি সহজেই ভয় পাই। ঋষিকে জিগগেস করলাম, 'আমরা কি সবাই মরে যাব?'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই—সবাই মরে যাব। সবাই মরে যায়! বড়ো-ছোটো, দুর্বল-সবল—কেউই চিরদিন বেঁচে থাকে না। আমরা মরে যাব।' আমার মলিন মুখ দেখে ঋষি একটু থেমে গেল। তারপর আবার বলল, 'দেখো, কিশলয়, আমরা সবাই আসি একটা কাজ নিয়ে। একটা ভূমিকা পালন করতে। সূর্যের আলোতে আমরা বেড়ে উঠি, চাঁদের আলো গায়ে মাখি, হাওয়ার সঙ্গে নাচি, বৃষ্টিতে স্নান করি। আমরা নাচতে শিখি, গাইতে শিখি, হাসতে শিখি। কখনো কখনো কাঁদিও। কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হলে আমরা চলে যাই। আমরা মরে যাই।'

ঋষির সব কথাই আমি নীরবে মেনে নিয়েছি। কোনো প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আজ পারলাম না। প্রায় প্রতিবাদের

সুরে গলায় জোর এনে বললাম, 'আমি মরব না!' তারপর থেমে আবার বললাম, 'ঋষি, তুমি কি মরবে?'

ঋষির মুখের একটি পেশিও নড়লো না। অবলীলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমি মরব তো! আমার যখন সময় হবে, তখন আমি মরে যাব।'

'সময়! কখন সময় হবে?'—আমি জিগগেস করলাম।

ঋষি বলল, 'সেটা কেউই ঠিক করে জানে না।'

আমি ভাবলাম, ঋষি নিশ্চয় ভুল বলেছে। এই যে আমি, বেঁচে আছি, ভাবছি, ভালোবাসছি, কল্পনা করছি—এই আমি কি মরতে পারি? কক্ষনো না!

কিন্তু দিন যায়। আমি লক্ষ করি, আরও পাতা ঝরে পড়ছে। মা-গাছের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। তা হলে, ঋষিই কি ঠিক বলেছে? তা হলে এদের কি সময় হয়ে গেছে?

আমি লক্ষ করলাম, কোনো কোনো পাতা ঝরে পড়ার আগে প্রাণপণ গাছটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। হাওয়াকে ফাঁকি দিতে চায়। আবার কেউ কেউ হাওয়ায় চড়ে মৃত্যুর রথ এলে নিজের বাঁধনটাকে ছেড়ে দেয়। তারপর ঝরে পড়ে নীরবে, শান্তভাবে।

দিন থেমে থাকে না। তারই মধ্যে একদিন আমি চারদিকটা চেয়ে দেখি। দেখলাম, গাছের ডালগুলো প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। একদিন ঋষিকে বললাম, 'ঋষি, তুমিই বোধহয় ঠিক। হয়তো মরতেই হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে। আমি জানি না নিচে, গভীরে কী আছে। মনে হয়, সেখানে আছে এক রাশ জমাট-বাঁধা অন্ধকার।'

শান্ত কণ্ঠে ঋষি বলল, 'দেখো, কিশলয়, আমরা যা জানি না, তাকে আমরা সবাই ভয় পাই।' 'কিন্তু বসন্ত গিয়ে যখন গরমের সময় এলো, তখন তো আমরা ভয় পাইনি! গরমের সময় গিয়ে যখন হেমন্ত এলো তখনো তো ভয় পাইনি। এই পরিবর্তনই স্বাভাবিক। তা হলে মৃত্যুর ঋতু দেখে ভয় পাব কেন?'

'আমাদের মা-গাছ? সেও কি মরে যাবে?'

'হ্যাঁ, একদিন সেও মরে যাবে। কিন্তু সে কথা থাক। মনে রেখো, এ গাছের থেকেও শক্তিশালী একটা জিনিস আছে। সে হলো জীবন। জীবনের কোনো শেষ নেই। আমরা সেই অন্তহীন জীবনের অংশ।'—ঋষি বুঝিয়ে বলল।

'আমরা কি আবার ফিরে আসব? আগামী বসন্তে?'

'না, আমরা বোধহয় ফিরব না। কিন্তু জীবন থেমে যাবে না। জীবন আবার ফিরে আসবে।'

আমার মন তবু তৃপ্তি পায় না, সান্ত্বনা পায় না। আবার বলি, 'তাহলে এই যে এলাম, এই যে বড়ো হলাম, হাসিকান্নায় এত দিন বেঁচে থাকলাম, এর মানে কী?' একটু থেমে আবার ভেবে বললাম, 'যদি ঝরেই যাব, যদি

বিদায় নিতেই হবে, তাহলে এসেছিলাম কেন?'

কোনো আবেগ দেখাল না ঋষি। বলল, 'এটাই জীবন। এই যে সূর্যের আলোতে বেঁচে থাকলাম, এই যে চাঁদের আলোর স্নেহশীতল স্পর্শ পেলাম, এই তো জীবন! একসঙ্গে আনন্দের সময় কাটিয়েছি আমরা। ছায়া দিয়েছি। বুড়োবুড়ি আর শিশুদের দেখেছি—সেবা করেছি। হেমন্তে রঙের খেলা দেখেছি। দেখেছি ঋতুবদলের পালা। এই কি যথেষ্ট নয়? এই তো জীবন!'

সেদিন গোধূলি আলোয় হাওয়ার রথ এলো। ঋষি তাতে চেপে বসল। মনে হলো, পড়ে যেতে যেতেও সে শান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত। দূরে যেতে যেতে আমাকে বলল, 'কিশলয়, এখনকার মতো বিদায়, ভাই!'

ডালটায় আর কেউ বাকি নেই। শুধু আমি। একা। কোথায় গেল আলো, বেণু, পর্ণা! খেয়াল করিনি তো! কোথায় গেল আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু—ঋষি! আমি বেঁচে আছি। কিন্তু নিঃসঙ্গ।

পরের দিন মরসুমের প্রথম বরফ পড়ল। পেঁজা তুলোর মতো! সুন্দর! কোনো ভার নেই তার কিন্তু ভারি ঠান্ডা। সেই সঙ্গে কনকনে উত্তুরে হাওয়া। সূর্যের আলো দেখা গেল না প্রায় সারা দিন। দিনটা কেটে গেল দেখতে দেখতেই। মনে হলো, আমার যেটুকু রং বাকি ছিল, তাও যেন হারিয়ে গেল। ডালটাকে ধরে রাখার শক্তি আমার যেন লোপ পাচ্ছে। তারই মধ্যে বরফ পড়ছে নিঃশব্দে। রাতের নীরব অন্ধকারে অজানা কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমার ওপর বরফ জমে উঠছে ধীরে ধীরে।

ভোরবেলাতে একটা হাওয়া এলো। সেই সঙ্গে যেন এলো অজানার আহ্বান। আমি ডালটাকে ছেড়ে দিলাম। একটুও লাগল না আমার। আমি যেন ভেসে চলেছি নিচের দিকে, খুব ধীরে। তারপর মাটিতে পড়ে প্রথমবারের মতো দেখতে পেলাম পুরো গাছটাকে। কী বিশাল! কী দৃঢ়। নিশ্চিত জানি, আমি বিদায় নিলেও এ গাছ বেঁচে থাকবে বহুকাল! জানি আমিও জীবনের অংশ ছিলাম। ভাবতেও আমার গর্ব হচ্ছে—আমি জীবনের অংশ ছিলাম। জীবনের ধন কিছুই বিফলে যায়নি। কিছুই বিফলে যাবে না।

আমি পড়লাম, তুলোর মতো নরম এক তাল বরফের ওপর। মনে হলো, সে বরফ নিষ্প্রাণ শীতল নয়। তার ভেতর প্রাণের উষ্ণতা টের পেলাম যেন। আমি বড্ড ক্লান্ত। চোখ খুলে রাখতে পারছি না। ঘুম পাচ্ছে আমার।

কিশলয় সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

কিশলয় জানত না, শীতের পরে আবার বসন্ত আসবে। জানত না, চিরদিন বরফ থাকবে না। বরফ গলে গিয়ে জল হবে। সে জানত না, সেই জলে মিশে তার শুকনো দেহটা মা-গাছের শেকড়ে গিয়ে আবার গাছে মিশে যাবে। জানত না, তার দেহটা বিফলে যাবে না। গাছটা আরও জোরালো হয়ে উঠবে। যা একদমই জানত না কিশলয়, সে হলো: গাছ আর মাটিতে মিলে এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছে নতুন ফাল্গুনে আরেক রাশ পাতা আসবে গাছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অন্তহীন: অশেষ।

অবলীলায়: অনায়াসে।

কিশলয়: নতুন পাতা।

বান: বন্যা।

মগডাল: গাছের সবচেয়ে উঁচু যে ডাল।

মরশুম: মৌসুম।

৩.৫.২ পড়ে কী বুঝলাম

'কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. লেখক এই রচনায় প্রকৃতির পালাবদলের কেমন ছবি এঁকেছেন?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খ. মানুষের জীবনের সাথে গাছের পাতার মিল কোথায়?

গ. এই রচনায় জীবন সম্পর্কে লেখকের কোন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

৩.৫.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে উত্তর মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. আমরা সবাই আসি একটা কাজ নিয়ে। একটা ভূমিকা পালন করতে।	এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক আসলে পাতার নয়, প্রকারান্তরে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন।
২.	
৩.	

৩.৫.৪ এটি কেন কল্পনানির্ভর লেখা

'কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু' শিরোনামের রচনাটিকে কেন কল্পনানির্ভর লেখা বলা যায়? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

কল্পনানির্ভর লেখা

চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে বাস্তব জগৎ। কল্পনানির্ভর রচনায় থাকে কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনা কিংবা চরিত্র। বিভিন্ন ধরনের কল্পনানির্ভর রচনা রয়েছে:

রূপকথা: এ ধরনের রচনায় রাজা, রানি, দৈত্য-দানব ইত্যাদি থাকে। এসব গল্প সাধারণত মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকে এবং একটি গল্পের কাঠামো পায়।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি: এ ধরনের রচনায় ভবিষ্যতের জগৎ, বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত এলাকা, গ্রহান্তরের কাল্পনিক ধারণা ইত্যাদি যুক্ত থাকে।

রম্যরচনা: এ ধরনের রচনায় লেখক সরস ভঙ্গিতে কোনো বক্তব্য বা কাহিনি তুলে ধরেন। অনেক সময়ে কৌতুক-হাস্যরস, কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ব্যবহার করে এ ধরনের লেখাকে আকর্ষণীয় করা হয়ে থাকে।

এছাড়া অতিকল্পনা রয়েছে এমন গল্প-উপন্যাসকেও কল্পনানির্ভর রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। 'কিশলয়ের জন্ম-মৃত্যু' এ ধরনের একটি কল্পনানির্ভর রচনা।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাকরণ মেনে লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

শব্দ

৪.১.১ বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের প্রয়োগ

নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগ করো।

বিশেষ্য

- লোকটি উদার। তাঁর .... আমি মুগ্ধ হলাম। ('উদার' শব্দটিকে দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ্য হিসেবে প্রয়োগ করো)
- তিনি দরিদ্র। কিন্তু .... তাঁকে লোভী করেনি। ('দরিদ্র' শব্দটিকে দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ্য হিসেবে প্রয়োগ করো)
- কত বিচিত্র ধরনের পাখি রয়েছে! শুধু পাখি নয়, এই .... প্রাণীজগতের সবখানেই লক্ষ করা যায়। ('বিচিত্র' শব্দটিকে দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ্য হিসেবে প্রয়োগ করো)

সর্বনাম

- বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। (এই বাক্যে কর্তা হিসেবে একটি সর্বনাম যোগ করো)
- শিক্ষার্থীরা ক্লাসে নিজেদের দলে আলোচনা করছিল। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। (দ্বিতীয় বাক্যে 'শিক্ষার্থীদের' বদলে সর্বনাম বসাও)
- বরকত সাহেব সিলেটে বেড়াতে গেছেন। সিলেটে অনেক চা-বাগান আছে। (দ্বিতীয় বাক্যে স্থাননামের বদলে সর্বনাম বসাও)

বিশেষণ

- মামা ঝুড়িতে করে ফল নিয়ে এসেছেন। ('ঝুড়ি' ও 'ফল' শব্দের আগে বিশেষণ যোগ করো)
- লোকটি সাহায্যের জন্য হাত পাতল। ('লোকটি' শব্দের আগে একাধিক শব্দযুক্ত বিশেষণ যোগ করো)
- তাঁর সরলতায় আমি মুগ্ধ হলাম। লোকটি আসলেই ....। ('সরলতা' শব্দটিকে দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করো)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ক্রিয়া

- তিনি শোকে পাথর হয়ে এসেছেন। (ক্রিয়ার রূপ সংশোধন করো)
- সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে শিক্ষকের কাছে গেল। (অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ সংশোধন করো)
- পাখি আকাশে উড়ে। (সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ সংশোধন করো)

ক্রিয়াবিশেষণ

- ছেলেটি হাঁটছে। (বাক্যটিতে ক্রিয়াবিশেষণ যোগ করো)
- বৃষ্টি পড়ছে। (বাক্যটিতে ক্রিয়াবিশেষণ যোগ করো)
- তিনি নদীর ধারে হাঁটতেন। (বাক্যটিতে কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ যোগ করো।)

অনুসর্গ

- মাথার .... নীল আকাশ। (বাক্যে একটি অনুসর্গ বসাও।)
- কার .... গেলে জানা যাবে? (বাক্যে একটি অনুসর্গ বসাও।)
- মন .... লেখাপড়া করবে। (বাক্যে একটি অনুসর্গ বসাও।)

যোজক

- কলা, পাউরুটি কিনে নিয়ে এসো। ('কমা'র বদলে যোজক ব্যবহার করো।)
- তাকে আসতে বললাম। সে এলো না। (দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে যোজক যোগ করো।)
- বসার সময় নেই। যেতে হচ্ছে। (দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে যোজক যোগ করো।)

আবেগ

- তুমি তো দারুণ লিখেছ! (প্রশংসাসূচক আবেগ যোগ করো)
- ছেলেটির কী কষ্ট! (করুণাসূচক আবেগ যোগ করো)
- অবশ্যই আমি যাব। (সম্মতিসূচক একটি আবেগ যোগ করো।)

৪.১.২ শব্দের লগ্নক

নিচের বাক্যগুলোতে 'মহিষ' এবং 'টান' শব্দের সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত শব্দাংশগুলো আলাদা করো।

মহিষগুলো গাড়ি টানছে।	মহিষ+ ____________	টান+____________
মহিষটি গাড়ি টানছিল।	মহিষ+ ____________	টান+____________
মহিষও গাড়ি টানে।	মহিষ+ ____________	টান+____________
মহিষে গাড়ি টানত।	মহিষ+ ____________	টান+____________

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তার সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়। শব্দের সঙ্গে যুক্ত এসব শব্দাংশকে লগ্নক বলে।

লগ্নক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যথা— ১. শব্দবিভক্তি, ২. ক্রিয়াবিভক্তি, ৩. নির্দেশক, ৪.বচন এবং ৫. বলক।

১. শব্দবিভক্তি: বাক্যের মধ্যে এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের সম্পর্ক বোঝাতে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, সেগুলোকে শব্দবিভক্তি বলে। যেমন: -কে, -রে, -র, -এর, -এ, -তে ইত্যাদি। শব্দবিভক্তির প্রয়োগ:

তিনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেছেন।

বাড়ির পিছনে বড়ো ভাইয়ের হাঁসের খামার।

সিলেটে বৃষ্টি বেশি হয়, রাজশাহীতে কম হয়।

২. ক্রিয়াবিভক্তি: যেসব বিভক্তি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেগুলোকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। ক্রিয়াবিভক্তিগুলো ক্রিয়ার কাল ও পক্ষ নির্দেশ করে। যেমন: -এ, -এন, -এছিলে ইত্যাদি। ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ:

সে বই পড়ে।

তিনি বই পড়েন।

তুমি বই পড়েছিলে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৩. নির্দেশক: যেসব লগ্নক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন: -টা, -টি, -খানা, -খানি, -টুকু, -জন ইত্যাদি। নির্দেশকের প্রয়োগ:

পুরাতন বাড়িটা ভেঙে পড়ছে।

ঝড়ে পড়া আহত পাখিটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল।

ব্যাপারখানা মন্দ নয়।

মুখখানি কেন ভার করে রেখেছ?

লোকজন একসঙ্গে বসে গল্প করছে।

৪. বচন: যেসব লগ্নক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাধিক সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। যেমন: -গুলো, -রা, -গণ, -দের, -সব, -বৃন্দ ইত্যাদি। বচনের প্রয়োগ:

বইগুলো সরিয়ে রাখো।

ছেলেরা বল খেলছে।

শিক্ষকগণ একজন একজন করে বক্তৃতা করছেন।

প্রধান অতিথি মেয়েদের হাতে বই তুলে দিলেন।

ভাইসব, আগামীকাল বিকাল তিনটায় জনসভা।

দর্শকবৃন্দ নাটকের শেষে করতালি দিলেন।

৫. বলক: যেসব লগ্নক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের উপরে বাড়তি জোর তৈরি করে, সেগুলোকে বলক বলে। বহুল ব্যবহৃত বলক: -ও, -ই। বলকের প্রয়োগ:

সে একটু আগে শরবত খেয়েছে, এখন কফিও খেতে চাচ্ছে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

৪.১.৩ শব্দের লগ্নক খুঁজি

নিচে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো। এটি তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার জাগরণ', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'নজরুল প্রতিভা' ইত্যাদি। তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'নদীবক্ষে'।

এই প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন ধরনের লগ্নক শনাক্ত করো এবং প্রদত্ত ছকে লেখো।

সাহিত্য-জগৎ

কাজী আবদুল ওদুদ

সাহিত্য-জগৎ বলে একটা স্বতন্ত্র স্বয়ং-পূর্ণ জগৎ আছে কি? যাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-বাদী তাঁরা সোৎসাহে বলে উঠবেন: নিশ্চয়ই। তাঁদের দলে কৃতী সাহিত্যিকের অভাব নেই, তবু তাঁদের দলে ভিড়তে স্বতই সংকোচ জাগে, বিশেষ করে এই যুগে। মানব-কল্যাণ জীবন-কল্যাণ তত্ত্ব সব শিরোধার্য করেও সাহিত্য-প্রচেষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে না বলে যেন উপায় থাকে না যে, সাহিত্য-জগৎ একটা স্বতন্ত্র জগৎ।

কথাটা মনে পড়ছে কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখে। বোঝা যাচ্ছে, আন্তরিকতায় তাঁদের ত্রুটি নেই, বাস্তবিকই তাঁরা কিছু একটা করতে চাচ্ছেন বা হতে চাচ্ছেন, আর তাঁদের দৃষ্টিও সাহিত্যের জগতের দিকে। তবু মনে হচ্ছে, যে পথে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তা ঠিক সাহিত্যের পথ নয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা, নর-নারীর সমস্যা, সব বিষয়ে তাদের কৌতূহল যথেষ্ট তীব্র, কিন্তু মনে হচ্ছে সেই তীব্রতা এতখানি যে, সেই জন্যই সাহিত্যের সুর তাতে ঠিক লাগছে না। সাহিত্য সমস্ত সমস্যারই আলোচনার ক্ষেত্র হতে পারে, হয়েও এসেছে চিরকাল, এমনকি যখন হয়নি তখনই সাহিত্য স্বাদহীন পানসে হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই আলোচনার একটা বিশিষ্ট ধরন আছে—যেমন নাচের একটা বিশিষ্ট ধরন আছে, তার বাইরে গেলেই তা মাত্র লাফালাফি।

সাহিত্যের সেই ধর্মের একটি নাম মাত্রা-বোধ। সাহিত্য অনুভূতির প্রকাশক্ষেত্র-মাত্র নয়, অনুভূতির সুপ্রকাশ-ক্ষেত্র। সেই সুপ্রকাশের সঙ্গে কৌতূহল এবং স্থৈর্য গাম্ভীর্য এবং ব্যঙ্গ আশ্চর্যভাবে মিশ্রিত। এই সব পরস্পর-বিরোধিতার যেখানে মিলন ঘটেছে, সেখানেই সাহিত্যিক-শ্রী দেখা দিয়েছে। শুধু ঔৎসুক্য, শুধু গাম্ভীর্য মূল্যহীন নয় কখনো, কিন্তু যত মূল্যবানই হোক সাহিত্যিক-শ্রী থেকে বঞ্চিত।

মনে হতে পারে তাহলে তো সাহিত্যে 'শিল্পের জন্য শিল্প'-বাদীদের মতই সত্য। এক হিসেবে এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু 'শিল্পের জন্য শিল্প'-বাদে এমন একটা স্বস্তিবোধ রয়েছে, যাকে স্বাভাবিক ভাবা কঠিন। গাছে যে ফুল হয় তা গাছের কাণ্ড, ডালপালা ও পাতা থেকে স্বতন্ত্র নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বতন্ত্র হয়েও তা গাছের অংশ ভিন্ন আর কিছু নয়। সাহিত্যও তেমনি, হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-বিকার-ব্যর্থতাময় যে জীবন তারই একটি প্রকাশ। সেই বিরাট

জীবনের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী যোগ নষ্ট হলে, তা হয়ে পড়ে অদ্ভুত এবং অসার। যেমন সত্যিকার ফুলের সঙ্গে তুলনায় কাগজের ফুল অদ্ভুত এবং অসার।

সাহিত্য জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। আবার তার থেকে এক হিসেবে স্বতন্ত্র। এ কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে।

ব্যাপারটা বাস্তবিকই বড়ো জটিল। তবে কিছু বোঝা যায় যদি এই কথা মনে রাখা যায়: জীবন থেকে সাহিত্যের জন্ম হলেও তার সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য এই যে, তা জীবনের মতো অস্থির, অপূর্ণাঙ্গ ও সতত পরিবর্তনশীল নয়। বরং, এই সতত পরিবর্তনশীল জীবনের বুকে সে যেন এক অচঞ্চল স্বপ্ন, তা যত অল্পক্ষণের জন্যেই হোক।

যে পূর্ণাঙ্গতা আমাদের জীবনে নেই, তারই সাধনা করি বা স্বপ্ন দেখি সাহিত্যে। এই পূর্ণাঙ্গতার জন্যেই অবশ্য স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গতা, সাহিত্য-জগৎ বাস্তবিকই একটু স্বতন্ত্র জগৎ।

শব্দের অর্থ

স্বয়ং-পূর্ণ: স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সোৎসাহে: উৎসাহের সঙ্গে ।

স্বতই: স্বাভাবিকভাবে।

স্থৈর্য: স্থিরতা।

ঔৎসুক্য: আগ্রহ।

লগ্নক	উদাহরণ
বচন	
নির্দেশক	
বলক	
শব্দবিভক্তি	
ক্রিয়াবিভক্তি	

২য় পরিচ্ছেদ

বাক্য

৪.২.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি

নিচের বাক্যগুলো থেকে উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয় ও বিধেয়ের প্রসারক আলাদা করো।

মেয়েটি গান করছে।

লাল জামা পরা মেয়েটি গান করছে।

লাল জামা পরা মেয়েটি হারমোনিয়াম নিয়ে গান করছে।

এই ভরদুপুরে লাল জামা পরা মেয়েটি হারমোনিয়াম নিয়ে গান করছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

উদ্দেশ্য: বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে বলে উদ্দেশ্য। যেমন, উপরের বাক্যগুলোতে 'মেয়েটি' হলো উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্যের প্রসারক: উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক বলে। যেমন, উপরের বাক্যগুলোতে 'লাল জামা পরা' হলো উদ্দেশ্যের প্রসারক।

বিধেয়: উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বলে বিধেয়। যেমন, উপরের বাক্যগুলোতে 'গান করছে' হলো বিধেয়।

বিধেয়ের প্রসারক: বিধেয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তাকে বিধেয়ের প্রসারক বলে। যেমন, উপরের বাক্যগুলোতে 'হারমোনিয়াম নিয়ে' এবং 'এই ভরদুপুরে' হলো বিধেয়ের প্রসারক।

বাক্যের শব্দ ও শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করি

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ প্রায়ই গুচ্ছ আকারে ব্যবহৃত হয়। যেমন: এই ভরদুপুরে লাল জামা পরা মেয়েটি হারমোনিয়াম নিয়ে গান করছে। এই বাক্যের বর্গসমূহ: এই ভরদুপুরে/ লাল জামা পরা/ মেয়েটি/ হারমোনিয়াম নিয়ে/ গান করছে।

নিচের বাক্যগুলো থেকে বর্গ আলাদা করো। একটি করে দেওয়া হলো।

সুমিতা কিছুক্ষণ ধরে গান গাইছে।	সুমিতা/ কিছুক্ষণ ধরে/ গান গাইছে
শায়িরা ও রিতা বাগানে খেলছে।	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমার বোন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে।

প্রতিবন্ধী ছেলেটি অসাধারণ ছবি আঁকে।

আমার বাবা প্রতিদিন বিকালে নদীর ধারের পার্কে হাঁটেন।

পরীক্ষা শুরু হবে ঠিক সকাল দশটায়।

বর্গ

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ কয়েক ধরনের হতে পারে:

১. বিশেষ্য বর্গ: একাধিক বিশেষ্য নিয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়। বিশেষ্য শব্দের আগে সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়েও বিশেষ্য বর্গ তৈরি হতে পারে।

যেমন: <u>রহিম ও করিম</u> বৃষ্টিতে খেলছে। <u>মোল্লাবাড়ির কায়সার</u> ভালো একটা চাকরি পেয়েছে।

২. বিশেষণ বর্গ: বিশেষণজাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলা হয় বিশেষণ বর্গ।

যেমন: <u>নীল শার্ট পরা</u> ছেলেটি কবিতার বই পড়ছে। আমটা দেখতে <u>ভারী সুন্দর</u>।

৩. ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ: যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ বলে।

যেমন: <u>সকাল আটটার সময়ে</u> সে রওনা হলো। আমরা <u>তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে</u> দাঁড়ালাম।

৪. ক্রিয়া বর্গ: বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়া বর্গ তৈরি করে।

যেমন: অস্ত্রসহ সৈন্যদল <u>এগিয়ে চলেছে</u>। সে <u>লিখছে আর হাসছে</u>।

বিভিন্ন ধরনের বর্গ খুঁজি

নিচের বাক্যগুলোতে বর্গ চিহ্নিত করা আছে। এগুলো কোন ধরনের বর্গ তা পাশে লেখো।

আমার মামা <u>পড়ছে আর লিখছে</u>। ________________

সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে <u>চলে গেল</u>। ________________

<u>বিদ্যালয় সংস্কারের কাজ</u> দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ________________

অনুষ্ঠান শেষ করে তার <u>বাড়ি ফিরতে</u> রাত বারোটা বেজে গেল। ________________

<u>এক নম্বর কাউন্টারে</u> টিকিটের জন্য লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ________________

ঘুণে ধরা সমাজকে বাঁচাতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ____________________

রাকিব ও তনয় গিয়ে ফ্রিজটি নিয়ে এসেছে। ____________________

আমি সকাল থেকে বসে আছি। ____________________

সে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। ____________________

সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়লো। ____________________

শিশুটি অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে। ____________________

আমাদের ক্লাসের ছেলেরা পাশের গ্রামে খেলতে গেছে। ____________________

৩য় পরিচ্ছেদ

শব্দের অর্থ

প্রতিশব্দ

৪.৩.১ প্রতিশব্দ বসাই

নিচের অনুচ্ছেদের কোনো কোনো জায়গায় প্রতিশব্দ হিসেবে কিছু বিকল্প শব্দ রয়েছে। এসব বিকল্প শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করে অনুচ্ছেদটি আবার লেখো। প্রয়োজনে ঐসব জায়গায় অন্য প্রতিশব্দও ব্যবহার করতে পারো।

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য/আহার গ্রহণ করে। কিন্তু বেঁচে থাকাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য/কাজ/উদ্দেশ্য নয়। প্রাণীজগতের অন্য প্রাণীও খাদ্যের/খাবারের অন্বেষণে দিনের/জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়/নষ্ট করে। এছাড়া প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য সবাইকেই নিরাপদ আশ্রয়ের/বাসস্থানের সন্ধান/খোঁজ করতে হয়। মানুষ বাড়িঘর বানিয়ে সমাজবদ্ধভাবে/গোষ্ঠীবদ্ধভাবে/সম্মিলিতভাবে বাস করে। কিন্তু এই বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার বাইরেও তাকে ভাবতে হয় সমাজের/সভ্যতার উন্নতির বিষয়ে/ব্যাপারে। মানুষ তার জ্ঞান/প্রজ্ঞা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে/পানে। এই অগ্রসরতা আগামীর/ভবিষ্যতের পৃথিবীকে/দুনিয়াকে সহজতর/সুন্দর করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস/ধারণা।

প্রতিশব্দ শিখি

প্রায় একইরকম অর্থযুক্ত পরস্পর প্রতিস্থাপনযোগ্য শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। নিচে কিছু শব্দের কয়েকটি করে প্রতিশব্দ দেওয়া হলো।

অকস্মাৎ : আচমকা, হঠাৎ, সহসা, অতর্কিত, দৈবাৎ।

অক্ষয় : চিরন্তন, ক্ষয়হীন, অশেষ, অনন্ত, অনিঃশেষ, অন্তহীন, অবিনাশী।

অদ্ভুত : উদ্ভট, আজব, আজগুবি, তাজ্জব, বিস্ময়কর, আশ্চর্য, অভিনব, অস্বাভাবিক।

অবকাশ : সময়, ফুরসত, অবসর, ছুটি, সুযোগ।

অলস : আলসে, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা, অকর্মা, শ্রমকাতর, অকেজো, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ।

আনন্দ : খুশি, আমোদ, মজা, পুলক, হর্ষ, আহ্লাদ, স্ফূর্তি, সন্তোষ, প্রমোদ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস।

ইচ্ছা : আকাঙ্ক্ষা, আশা, অভিলাষ, প্রার্থনা, চাওয়া, স্পৃহা, অভিপ্রায়, সাধ, অভিরুচি, প্রবৃত্তি, ঈপ্সা, অভীপ্সা, বাসনা, কামনা, বাঞ্ছা।

উত্তম : শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভালো, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, সেরা, অতুলনীয়, প্রধান।

কঠিন : শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল, রুক্ষ।

কপাল : ললাট, বরাত, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, নসিব।

কষ্ট : যন্ত্রণা, দুঃখ, ক্লেশ, আয়াস, পরিশ্রম, মেহনত।

কিরণ : রশ্মি, শিখা, আলোকচ্ছটা, কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি।

কুল : বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাত, জাতি, বর্ণ।

কূল : তীর, তট, বেলাভূমি, সৈকত, ধার, বালুকাবেলা, কিনারা, পাড়।

খবর : সংবাদ, বার্তা, তথ্য, সমাচার, বিবরণ, সন্ধান, বৃত্তান্ত, খোঁজখবর।

খোঁজ : সন্ধান, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, খোঁজা, তালাশ।

গভীর : অগাধ, অতল, গহন, প্রগাঢ়, নিবিড়।

গৃহ : বাড়ি, ঘর, আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, আবাস, বাটি, কুটির।

চাঁদ : চন্দ্র, শশী, শশধর, বিধু, সোম, নিশাকর, সুধাংশু, সুধাকর, ইন্দু।

চোখ : চক্ষু, নয়ন, আঁখি, অক্ষি, নেত্র, লোচন।

জন্ম : উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব।

ঝোঁক : টান, প্রবণতা, আকর্ষণ।

ঠিক : যথাযথ, সত্য, সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, নির্ভুল, ন্যায্য, ভালো।

ঠাট্টা : বিদ্রুপ, শ্লেষ, মশকরা, উপহাস, রসিকতা।

ঢেউ : তরঙ্গ, কল্লোল, ঊর্মি, হিল্লোল, লহরি।

তৃষ্ণা : পিপাসা, তিয়াসা, তেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা।

দলিল : নথি, চুক্তিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা, দস্তাবেজ।

নতুন : নূতন, নবীন, আনকোরা, আধুনিক, অধুনা, অর্বাচীন।

নিত্য : সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, চির, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অনন্ত, রোজ।

পাথর : পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, উপল, অশ্ম, কঙ্কর, কাঁকর।

বাতাস : বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, প্রভঞ্জন।

বিদ্যুৎ : তড়িৎ, বিজলি, বিজুরি, অশনি।

বৃক্ষ : গাছ, তরু, দ্রুম, পাদপ, মহীরুহ, উদ্ভিদ।

ব্যবধান : ফাঁক, ছিদ্র, অন্তর, তফাত, ভেদ, পার্থক্য।

মৃত্যু : মরণ, ইন্তেকাল, বিনাশ, নিপাত, পরলোকগমন, লোকান্তর, চিরবিদায়, দেহত্যাগ, শেষনিশ্বাস ত্যাগ।

রাত : রাত্রি, রজনী, নিশি, নিশা, নিশীথ, নিশীথিনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী।

স্ত্রী : পত্নী, ভার্যা, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, দারা, জায়া, বধূ, বউ, বিবি, বেগম, গৃহিণী।

স্বর্ণ : সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ, হিরণ্য, হেম।

হীন : নীচ, অধম, নিন্দনীয়, অবনত, গরিব, অক্ষম, শূন্য, ক্ষীণ।

৪.৩.২ গদ্যে রূপান্তর করি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবেও পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে আছে 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী', 'দোলনচাঁপা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঁধন-হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'শিউলিমালা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্রমঙ্গল' ইত্যাদি।

নিচের কবিতাটি কবির 'সর্বহারা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি গদ্যে রূপান্তর করো। গদ্যে রূপান্তরের সময়ে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বদলে যত বেশি সম্ভব প্রতিশব্দ বসানোর চেষ্টা করো। শব্দের অর্থ বোঝার জন্য এবং প্রতিশব্দ খোঁজার জন্য প্রয়োজনে অভিধানের সহায়তা নাও।

কান্ডারি হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

১

দুর্গম গিরি কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার ॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে, নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারি! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা-র!

৪

গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কান্ডারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার!

৫

কান্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার!

৪.৩.৩ বিপরীত শব্দ লিখি

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) একজন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'অনল-প্রবাহ', 'রায়নন্দিনী', 'তারাবাঈ', 'স্ত্রীশিক্ষা' ইত্যাদি।

নিচে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতায় যেসব শব্দের নিচে দাগ দেওয়া আছে, সেগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো।

জন্মভূমি

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম
শত শত দাস তার সেবুক চরণ
করুক স্তাবক দল স্তব সংকীর্তন।

কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

বিপরীত শব্দ

যেসব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। বিপরীত শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন—জীবিত-মৃত, গভীর-অগভীর, স্থির-গতিশীল ইত্যাদি। এসব শব্দযুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর একটিকে অস্বীকার করার মানে অন্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া। যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় তিনি 'জীবিত', তবে বোঝায় যে তিনি 'মৃত' নন। আবার যদি বলা হয় তিনি 'মৃত', তবে বোঝায় তিনি 'জীবিত' নন।

শব্দের পূর্বে অ, অন্, অনা, অপ, অব, অবি, দুর্, না, নি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীত শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন—চেনা থেকে অচেনা, আদর থেকে অনাদর, নশ্বর থেকে অবিনশ্বর। তবে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর বিপরীত শব্দ গঠনগতভাবে আলাদা। যেমন—ধনী-গরিব, আদি-অন্ত, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি।

নিচে কিছু শব্দ এবং তার বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

শব্দ	বিপরীত শব্দ		শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ		আপন	পর
অচল	সচল		আবশ্যক	অনাবশ্যক
অজ্ঞ	বিজ্ঞ		আবির্ভাব	তিরোভাব
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি		আমদানি	রপ্তানি
অধম	উত্তম		আয়	ব্যয়
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ		আশা	নিরাশা
অনুকূল	প্রতিকূল		আশু	বিলম্ব
অনুরক্ত	বিরক্ত		আস্থা	অনাস্থা
অনুরাগ	বিরাগ		ইস্তফা	যোগদান
অন্তর	বাহির		ইহলোক	পরলোক
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ		ইহা	উহা
অপরাধী	নিরপরাধ		উচ্চ	নীচ
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ		উৎকর্ষ	অপকর্ষ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ		উৎকণ্ঠা	স্বস্তি
অর্থ	অনর্থ		উৎসাহ	নিরুৎসাহ
অল্প	অধিক		উত্তর	দক্ষিণ
অস্তি	নাস্তি		উত্থান	পতন
আকর্ষণ	বিকর্ষণ		উদয়	অস্ত
আচার	অনাচার		উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
আত্মীয়	অনাত্মীয়		উন্নতি	অবনতি
আদান	প্রদান		উপসর্গ	অনুসর্গ

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
উপস্থিত	অনুপস্থিত	জড়	চেতন
উপশম	বৃদ্ধি	জয়	পরাজয়
ঊর্ধ্ব	অধ	জাগরণ	নিদ্রা
এলোমেলো	গোছানো	জোয়ার	ভাটা
ওস্তাদ	সাগরেদ	জ্ঞানী	মূর্খ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	জ্বলন	নির্বাপণ
কৃপণ	উদার	টাটকা	বাসি
কেজো	অকেজো	ঠকা	জেতা
কোমল	কর্কশ	তফাত	কাছে
খাঁটি	ভেজাল	তিরস্কার	পুরস্কার
খাতক	মহাজন	তেজী	নিস্তেজ
খানিক	অধিক	ত্বরিত	শ্লথ
খুঁত	নিখুঁত	দাতা	গ্রহীতা
খুচরা	পাইকারি	দীর্ঘ	হ্রস্ব
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	দুর্মতি	সুমতি
গূঢ়	ব্যক্ত	দুষ্ট	শিষ্ট
গৃহী	সন্ন্যাসী	দূর	নিকট
গ্রহণ	বর্জন	দোষী	নির্দোষ
ঘাটতি	বাড়তি	ধনী	দরিদ্র
ঘাত	প্রতিঘাত	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
চেতন	অচেতন	নিদ্রিত	জাগ্রত

শব্দ	বিপরীত শব্দ		শব্দ	বিপরীত শব্দ
নিন্দা	প্রশংসা		ভীরু	নির্ভীক
পণ্ড	সফল		ভূত	ভবিষ্যৎ
পথ	বিপথ		ভোঁতা	ধারালো
পুষ্ট	ক্ষীণ		মান	অপমান
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ		মুখ্য	গৌণ
প্রফুল্ল	বিমর্ষ		মৃদু	প্রবল
প্রবল	দুর্বল		মৌন	মুখর
প্রখরতা	স্নিগ্ধতা		যাচিত	অযাচিত
প্রাচী	প্রতীচী		যুক্ত	বিযুক্ত
প্রাচ্য	প্রতীচ্য		রত	বিরত
বন্ধন	মুক্তি		রদ	চালু
বলবান	দুর্বল		রসিক	বেরসিক
বাউন্ডুলে	সংসারী		রিক্ত	পূর্ণ
বাচাল	স্বল্পভাষী		রুগ্ন	সুস্থ
বাদী	বিবাদী		রোগ	নীরোগ
বিচ্ছেদ	সন্ধি		লঘু	গুরু
বিশেষ	সামান্য		লাভ	ক্ষতি
ব্যর্থ	সার্থক		লেজ	মাথা
ভয়	সাহস		শিষ্ট	অশিষ্ট
ভর্ৎসনা	প্রশংসা		শীঘ্র	বিলম্ব
ভিতর	বাহির		সওয়াল	জবাব
ভিতু	সাহসী		সংহত	বিভক্ত

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট	সুশীল	দুঃশীল
সজীব	নির্জীব	সৃষ্টি	ধ্বংস
সঞ্চয়	অপচয়	স্থাবর	অস্থাবর
সদয়	নির্দয়	স্থির	চঞ্চল
সদ্ভাব	বিরোধ	স্বনামে	বেনামে
সমস্ত	অংশ	স্ববাস	প্রবাস
সম্বল	নিঃসম্বল	স্বমত	পরমত
সরব	নীরব	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সরস	নীরস	হক	নাহক
সাকার	নিরাকার	হরণ	পূরণ
সার্থকতা	ব্যর্থতা	হরদম	হঠাৎ
সুকৃত	দুষ্কৃত	হার	জিত
সুন্দর	কুৎসিত	হাল	সাবেক
সুবহ	দুর্বহ	হালকা	ভারী
সুলভ	দুর্লভ	হ্রাস	বৃদ্ধি

৪.৩.৪ বিপরীত শব্দ বসাই

বিবৃতিবাচক বাক্য দুই ধরনের: হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক। নিচের অনুচ্ছেদের হ্যাঁ-বাচক বাক্যগুলোকে না-বাচক বাক্যে এবং না-বাচক বাক্যগুলোকে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে রূপান্তর করো। এই কাজের জন্য শব্দের বদলে বিপরীত শব্দ বসানোর প্রয়োজন হতে পারে।

লোকটি প্রবাসী। কিছু দিন আগে তিনি বিদেশে এসেছেন। এখানে আসার পর বেশিরভাগ সময়ে তাঁর মন খারাপ থাকে। মা-বাবার কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশে কত অলসতায় সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁকে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। বছর দুয়েক পর দেশে যাবেন। নিশ্চয় ততদিনে তাঁর ছোটো ভাইবোনগুলো ছোটো থাকবে না। তবু তাদের জন্য তিনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বানান ও অভিধান

৪.৪.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই

বাংলা অভিধানে যে ক্রমে বর্ণমালা সাজানো থাকে তা নিচে লেখো।

এই ক্রমের সঙ্গে শিশুপাঠ্য বইয়ের বর্ণানুক্রমের তফাত কোথায়?

নিচের বাম কলামের শব্দগুলোকে অভিধানের বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে ডান কলামে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

এলোমেলো শব্দ	বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজানো শব্দ
দুরন্ত, জাগরণী, দুর্জয়, জাঁকানো, ঘাপটি, আভরণ, মনোরম, সুকুমার, আবিষ্কার, সন্ধি, আড্ডা, বক্তব্য, ধৌত, বুভুক্ষা, সিঁধেল, চৌচির, শিয়র, কায়া, মুমূর্ষু, আকাশ, প্রত্যুক্তি, হর্ষ, খামখেয়ালি, কোন্দল, তৎপর, ছুতার, মৃন্ময়, তৃষিত, হেরফের, লৌকিক, নিরীক্ষক, বাঁশ, বন্ধু, বালতি, খেয়াল, ক্ষমা, খাঁ খাঁ, ঘুমন্ত, ডুবুরি, আড়াই, তত্ত্ব, আঁশ, কার্যকর।	

৪.৪.২ অভিধানে শব্দ খুঁজি

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের একজন গবেষক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য', 'বাঙলার সুফি সাহিত্য', 'বিচিত চিন্তা' ইত্যাদি।

নিচে আহমদ শরীফের লেখার একটি অংশবিশেষ দেওয়া হলো। এখানকার কিছু শব্দের নিচে দাগ দেওয়া আছে। শব্দগুলো অভিধান থেকে খুঁজে বের করো এবং খাতায় শব্দগুলোর অর্থ লেখো।

জিগীষা

আহমদ শরীফ

আরবিতে যা মাগাজি, ফারসিতে তা-ই জঙ্গ, সংস্কৃতে যুদ্ধ এবং বাংলায় লড়াই। বাঘ-সিংহের প্রতি ভয়াল বলেই যেমন মানুষের একটা আকর্ষণ রয়েছে, গা-পা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হিংস্র শ্বাপদ-সরীসৃপ দেখা যেমন আনন্দজনক, তেমনি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদের লড়াই বা যুদ্ধ দেখা, তার বর্ণনা শোনা সুখকর। এ যুগে যুদ্ধের ধরন বদলে গেছে, বিবর্তিত হয়েছে যুদ্ধাস্ত্র, তবু আজও তরবারির প্রতীকী মান, অশ্বের ও হস্তীর পার্বণিক মর্যাদা আর সেনানিবাসে রণবাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন ফুরায়নি।

স্বস্থ ও সুস্থ মানুষের চেতনার গভীরে জীবনের যা মূল প্রেরণা তা হচ্ছে জিগীষা, সেই ভিনি-ভিডি-ভিসি।

আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ বাস্তবে এ জিগীষা চরিতার্থ করে, আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল মানুষ বিকৃত উপায়ে তা অনুভব-উপভোগ করেই থাকে তুষ্ট। বিভিন্নভাবে অপরকে উপকৃত করে ঋণী ও কৃতজ্ঞ রেখেই সাধারণ মানুষ জিগীষা পূরণ করে, অন্যেরা গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতর হয়ে কিংবা ধনবলে, জনবলে, বাক্যবলে, জ্ঞানবলে অতুল্য হয়ে কর্মে-ক্রীড়ায়-কৌশলে নৈপুণ্যে-উৎকর্ষে অনন্য-অজেয় হয়ে মানুষ বিজয়ানন্দ অনুভব করে। আর রাজতন্ত্রের যুগে দিগ্বিজয়ী রাজারা, সেনারা, মল্লরা, পালোয়ানরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাহুবলে কিংবা অস্ত্রযোগে লড়ে জয়ী হয়ে বিজয়গৌরব উপভোগ করত। এ যুগেও সৈনিকরা তা-ই করে, সমুদ্রতলার পর্বতচূড়ার ও গ্রহলোকের অভিযাত্রীরাও এ জিগীষু বীর। মৃত্যুকে যে ভয় পায় না সে-ই বীর।

আজও ব্যক্তিক, পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, জাতিক, রাষ্ট্রিক জীবনে লড়াই-ই—যুদ্ধই জীবনের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। এ লড়াইয়ের নাম প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধনের মানের যশের কথার লড়াই, ক্ষমতার ভোগের চিন্তার মতের লড়াই চলছে সর্বদা ও সর্বথা। জেতাই লক্ষ্য।

তাই লড়াই করতে-করাতে নয় শুধু লড়াই দেখতেও সুখ। যেখানে প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে যুদ্ধ সেখানেই মানুষের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাই যুদ্ধকাব্য লোকপ্রিয়, পৃথিবীর প্রাচীন মহাকাব্যগুলো নয় কেবল, রূপকথাগুলোও রাজকুমারদের প্রাণপণ সংগ্রামের, বিপন্ন নায়কের সংকট উত্তরণের এবং বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিকথা।

অভিধানের ভুক্তি

অভিধানের যে অংশে কোনো শব্দের অর্থ ও অন্যান্য পরিচিতি থাকে, তাকে ঐ শব্দের ভুক্তি বলে। নিচে চারটি ভুক্তি দেওয়া হলো। ভুক্তিগুলো থেকে শব্দের অর্থ ও পরিচিতি পাওয়া যাবে। যেমন:

অচেতন /অচেতোন্/ [অ+চেতন] **১.** বিণ. চেতনাহীন। **২.** বিণ. জড়বস্তু।

গরম /গরোম্/ [ফা.] **১.** বিণ. তপ্ত। **২.** বি. গ্রীষ্মকাল।

মেঘাবৃত /মেঘাব্‌বৃতো/ [মেঘ+আবৃত] বিণ. মেঘে ঢাকা।

সাহেব /শাহেব্/ [আ. সাহিব] বি. সম্মানিত ব্যক্তি।

খেয়াল করো, ভুক্তির মধ্যে কয়েকটি অংশ রয়েছে:

শীর্ষশব্দ: ভুক্তির প্রথমে মোটা হরফে শব্দের বানান দেওয়া থাকে। মোটা হরফের এই শব্দটিকে শীর্ষশব্দ বলে। উপরের উদাহরণে অচেতন, গরম, মেঘাবৃত ও সাহেব শীর্ষশব্দ।

উচ্চারণ: শীর্ষশব্দের পরে বাঁকা দুই দাগের মধ্যে শব্দের উচ্চারণ দেখানো হয়। এখানে /অচেতোন্/, /গরোম্/, /মেঘাব্‌বৃতো/ এবং /শাহেব্/ শব্দগুলোর উচ্চারণ।

শব্দের গঠন: উচ্চারণের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শব্দের গঠন দেওয়া থাকে। এখানে প্রথম ও তৃতীয় ভুক্তিতে [অ+চেতন] এবং [মেঘ+আবৃত] হলো শব্দের গঠন।

শব্দের উৎস: উচ্চারণের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শব্দের উৎস দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভুক্তিতে দেখানো [ফা.] এবং [আ. সাহিব] হলো শব্দের উৎস। এখানে [ফা.] বলতে ফারসি এবং [আ.] বলতে আরবি উৎস থেকে শব্দগুলো এসেছে বোঝানো হচ্ছে।

অর্থান্তর সংখ্যা: কোনো কোনো ভুক্তিতে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যাগুলোকে বলে অর্থান্তর সংখ্যা। উপরের প্রথম দুটি ভুক্তিতে সংখ্যা (১, ২) দিয়ে ওই শব্দের একাধিক অর্থ বোঝানো হয়েছে।

শব্দের শ্রেণি: ভুক্তির শব্দটি কোন শ্রেণির তা প্রথম বন্ধনীতে সংক্ষেপে নির্দেশ করা থাকে। উপরের উদাহরণগুলোতে (বি.) দিয়ে বিশেষ্য এবং (বিণ.) দিয়ে বিশেষণ বোঝানো হয়েছে।

শব্দের অর্থ: ভুক্তির শীর্ষশব্দের এক বা একাধিক অর্থ থাকে। উপরের উদাহরণে প্রথম ভুক্তির দুটি অর্থ—চেতনাহীন ও জড়বস্তু। একইভাবে দ্বিতীয় ভুক্তির দুটি অর্থ—তপ্ত ও গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় ভুক্তির একটি অর্থ—মেঘে ঢাকা; এবং চতুর্থ ভুক্তির একটি অর্থ—ব্যক্তি।

৪.৪.৩ ভুক্তি তৈরি করি

অভিধান দেখে যেসব শব্দের অর্থ লিখেছ, তার মধ্য থেকে দুটি শব্দের ভুক্তি তৈরি করো। ভুক্তিগুলো যথাযথ হলো কি না, তা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো। প্রয়োজনে অভিধানের সহায়তা নাও এবং সংশোধন করো।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি

৫.১ বিবরণমূলক রচনা লিখি

নিচে চারটি ধারাবাহিক ছবি দেওয়া হলো। ছবিগুলো ভালোভাবে দেখো এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি বিবরণমূলক রচনা তৈরি করো। একেকটি ছবির জন্য একটি করে অনুচ্ছেদ লেখো। রচনাটির আয়তন হবে ২৫০-৩০০ শব্দ। রচনার শুরুতে একটি শিরোনাম দাও। বিবরণ লেখার জন্য প্রয়োজনে 'আমার বাংলা খাতা' ব্যবহার করো।

শিরোনাম: ____________________

অনুচ্ছেদ ১

____

____

অনুচ্ছেদ ২

অনুচ্ছেদ ৩

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনুচ্ছেদ ৪

____

____

____

____

____

____

তোমার লেখা রচনাটি সহপাঠীদের দেখাও। তোমার লেখা সম্পর্কে অন্যদের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচে লিখে রাখো:

- ____
- ____
- ____
- ____

৫.২ বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি

এবার ঐ একই বিষয়ের উপর ২০০ শব্দের একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। লেখা তৈরি করার আগে প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহ করো। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, পত্রিকা, বই, অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।

শিরোনাম: ______________________________

তোমার লেখা রচনাটি সহপাঠীদের দেখাও। তোমার লেখা সম্পর্কে অন্যদের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচে লিখে রাখো:

-
-
-
-

বিবরণমূলক রচনা লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য

বিবরণমূলক রচনায় কোনো কিছুর বিবরণ দেওয়া হয়। এই বিবরণ হতে পারে কোনো ছবির, স্থানের, বস্তুর, ব্যক্তির, প্রাণীর, অনুভূতির, ঘটনার, ভ্রমণের, অতীত স্মৃতির, কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের। এসব বিবরণ লেখার সময়ে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে পারেন, কখনো কখনো স্মৃতির উপর নির্ভর করতে পারেন, তেমনি প্রয়োজনে সংগৃহীত তথ্যও কাজে লাগাতে পারেন।

বিবরণমূলক রচনা লেখার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার—

১. শুরুতে বিষয় অনুযায়ী একটি শিরোনাম দিতে হয়।

২. বিবরণে কী লিখতে হবে, তার একটি পরিকল্পনা করে নিতে হয়। একইসঙ্গে কোন বর্ণনার পরে কোন বর্ণনা আসবে, তা ঠিক করতে হয়।

৩. এ ধরনের রচনার অন্তত তিনটি অংশ থাকে: ভূমিকা, মূল অংশ ও উপসংহার।

৪. রচনার প্রবেশক হিসেবে এমন একটি ভূমিকা লিখতে হয় যা সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভূমিকায় একইসঙ্গে মূল বিবরণের ইঙ্গিতও থাকে।

৫. মূল অংশের বিবরণ কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখতে হয়। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে এমন বাক্য লিখতে হয়, যার সূত্র ধরে ঐ অনুচ্ছেদের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি এমন হতে হয়, যাতে বাক্যটি পরের অনুচ্ছেদের সূচনা বাক্যের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

৬. এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ নিয়ে অনেক সময়ে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদ তৈরি হতে পারে। তখন পরিচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনামও দেওয়া যায়।

৭. রচনার শেষে লেখকের সমাপনী বক্তব্য দিয়ে একটি উপসংহার তৈরি করতে হয়।

৮. বিবরণের ভাষা হতে হয় সহজ, সরল ও স্পষ্ট।

৯. বিবরণে একই কথার পুনরুল্লেখ করা যায় না।

১০. বিবরণে কোনো তথ্যের উল্লেখ থাকলে সেই তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয়।

১১. পুরো রচনাটি বিষয়-অনুযায়ী হতে হয়, অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন করতে হয়।

১২. অন্যের লেখা হুবহু অনুকরণ করা ঠিক নয়।

নমুনা: বিবরণমূলক রচনা

জাদুঘর ভ্রমণ

গত ডিসেম্বরে আমি মা-বাবার সঙ্গে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে গিয়েছিলাম। আমার ছোটো ভাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল জাতীয় জাদুঘর দেখতে যাব; কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জাদুঘর কেমন হয় তা আমি জানতাম। কিন্তু ছোটোবেলায় আমি মনে করতাম, জাদুঘরে জাদুকর থাকেন এবং সেখানে জাদু দেখানো হয়। একটু বড়ো হওয়ার পরে আমার এই ভুল ভেঙেছিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। দুপুরের খাওয়া শেষে আমরা বেলা আড়াইটার দিকে জাদুঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তায় খুব বেশি যানজট ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা জাদুঘরে পৌঁছে গেলাম। জাতীয় জাদুঘরটি শাহবাগে অবস্থিত। এই জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কারমাইকেল। পাশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট। আমার ভবিষ্যতে চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা। তাই বাবাকে বললাম, জাদুঘর দেখা শেষ হলে ওখানে নিয়ে যেতে। টিকিট কেটে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন জানলাম, অনলাইনেও টিকিট কাটা যায়।

মূল ভবনের প্রবেশপথে দরজার দুপাশে দুটি সুসজ্জিত কামান রয়েছে। মূল ভবনের নিচতলায় খাবারের দোকান, স্মারক বিপণি এবং ব্যাগ রাখার জায়গা আছে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। কোন পথ দিয়ে যেতে হবে, সেটির নির্দেশনা ছিল। ফলে গ্যালারি খুঁজে পেতে আমাদের সমস্যা হয়নি।

পুরোনো অনেক জিনিস সংরক্ষিত আছে এই জাদুঘরে। বিভিন্ন উপকরণ ও প্রত্নবস্তু প্রদর্শনের জন্য জাতীয় জাদুঘরে মোট ৪৬টি গ্যালারি আছে। জাদুঘরে একটি বড়ো সংরক্ষণাগারও আছে, যেখানে অপ্রদর্শিত বহু জিনিস জমা করে রাখা আছে। আর আছে একটি গ্রন্থাগার; সেখানে অনেক বই আছে। অনুষ্ঠান করার জন্য একটি মিলনায়তন আছে। আছে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনালয়ও।

জাদুঘরের প্রথম তলায় একটা বড়ো আকারের বাংলাদেশের মানচিত্র আছে। সেখানে সুইচ টিপে টিপে বিভিন্ন জেলার অবস্থান দেখা যায়। আমার ছোটো ভাই অনেকগুলো জেলার অবস্থান সুইচ টিপে দেখে নিল। এই তলায় বাংলাদেশের গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনযাত্রার ধরন প্রর্দশন করা হয়েছে। এখানে সুন্দরবনের একটা বড়ো মডেল আছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে একটি গ্যালারিতে।

আমরা সবগুলো গ্যালারিই দেখেছি। আমার ছোটো ভাইয়ের সবচেয়ে ভালো লেগেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রার গ্যালারি। আমার ভালো লেগেছে দোতলার গ্যালারি, যেখানে অন্য শিল্পীদের পাশাপাশি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও পটুয়া কামরুল হাসানের আঁকা ছবি আছে। বাবার কাছে ভালো লেগেছে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি। সেখানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মারক রয়েছে। মায়ের ভালো লেগেছে মসলিন কাপড়। একসময়ে এই মসলিনের জন্য বিশ্বজোড়া বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল।

আমরা জাদুঘরের চলচ্চিত্র প্রদর্শনালয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি ছবি দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আর দেখতে পারিনি। ঐদিন জাদুঘরের পাশে চারুকলা ইনস্টিটিউটেও আমাদের যাওয়া হয়নি। তাই খানিক মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছেন, সুযোগ পেলে তিনি সেখানে আবার আমাদের নিয়ে যাবেন।

আমি নিশ্চিত, জাদুঘরে থাকা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং অন্যান্য মূল্যবান উপকরণ যে কাউকে অভিভূত করবে। বাংলাদেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য আমাদের সবারই জাদুঘরে ভ্রমণ করা উচিত।

বিশ্লেষণমূলক রচনা লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য

বিশ্লেষণ দুই ধরনের হতে পারে; যথা: উপাত্ত বিশ্লেষণ ও তথ্য বিশ্লেষণ। উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন তথ্য তৈরি হয়। বিশ্লেষিত এসব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনা লেখা হয়। বিশ্লেষণমূলক রচনায় তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য ধারণা তৈরি হয়।

বিশ্লেষণমূলক রচনা লেখার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার—

১. শুরুতে রচনার লক্ষ্য অনুযায়ী একটি শিরোনাম দিতে হয়।

২. লেখা শুরু করার আগে রচনাটির একটি খসড়া পরিকল্পনা করে নিতে হয়। তথ্য, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের ধারাবাহিকতা রাখতে হয়।

৩. এ ধরনের রচনার অন্তত তিনটি অংশ থাকে: ভূমিকা, মূল অংশ ও উপসংহার।

৪. রচনার প্রবেশক হিসেবে এমন একটি ভূমিকা লিখতে হয় যা সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভূমিকায় একইসঙ্গে মূল বক্তব্যের ইঙ্গিতও থাকে।

৫. মূল অংশের বিবরণ কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখতে হয়। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে এমন বাক্য লিখতে হয়, যার সূত্র ধরে ঐ অনুচ্ছেদের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি এমন হতে হয়, যাতে বাক্যটি পরের অনুচ্ছেদের সূচনা বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে।

৬. এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ নিয়ে অনেক সময়ে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদ তৈরি হতে পারে। তখন পরিচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনামও দেওয়া যায়।

৭. রচনার শেষে লেখকের সমাপনী বক্তব্য দিয়ে একটি উপসংহার তৈরি করতে হয়।

৮. বিশ্লেষণের ভাষা হতে হয় সহজ, সরল ও স্পষ্ট।

৯. ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি এড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়।

১০. বিশ্লেষণমূলক রচনায় একই কথার পুনরুল্লেখ করা যায় না।

১১. উপাত্ত ও তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয়।

১২. প্রয়োজনে সারণি, ছক, ছবি ও নকশা ব্যবহার করার দরকার হতে পারে।

১৩. পুরো রচনাটি বিষয়-অনুযায়ী হতে হয়, অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন করতে হয়।

১৪. অন্যের লেখা হুবহু অনুকরণ করা ঠিক নয়।

নমুনা: বিশ্লেষণমূলক রচনা

বাংলাদেশের জাদুঘরের ধরন ও গুরুত্ব

ভূমিকা: সাধারণভাবে কোনো সংগ্রহশালাকে জাদুঘর বলা হয়। এটি এমন একটি স্থান বা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও মূল্যবান উপকরণ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। জাদুঘর অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। জাদুঘরের প্রকার অনুযায়ী এর গুরুত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা গুরুত্ব বহন করে জাদুঘর।

জাদুঘরের প্রকার: প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বস্তুসমূহের ভিত্তিতে জাদুঘর প্রধানত চার ধরনের: সাধারণ জাদুঘর, ঐতিহাসিক জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও কলা জাদুঘর।

সাধারণ জাদুঘর: কোনো দেশের জাতীয় জাদুঘর এ রকম জাদুঘর।

ঐতিহাসিক জাদুঘর: বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ও আরকাইভ এর উদাহরণ।

বিজ্ঞান জাদুঘর: ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর, প্রাণী জাদুঘর এর উদাহরণ।

কলা জাদুঘর: চিত্রকলা জাদুঘর এর উদাহরণ।

বাংলাদেশের জাদুঘর: বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর আছে। নিচের ছকে সেগুলোর কয়েকটি দেখানো হলো:

নাম	কোন ধরনের নিদর্শন আছে
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ৯৪ হাজার নিদর্শন।
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী	সিন্ধু সভ্যতা থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।
লোকশিল্প জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জ	প্রাচীন ও আধুনিককালের লোকজ নিদর্শন।
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	নবাবদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নমুনা।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: জাদুঘরে অতীতের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা হয়। প্রাচীন সভ্যতার গুহাচিত্র, প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপি, টেরাকোটা, তৈজসপত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, হাতিয়ার, মুদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি উপকরণ জাদুঘরে গিয়ে দেখার সুযোগ আছে। এসব উপকরণ থেকে বোঝা যায় কোন সময়ে কোন সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে, মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিতে কীভাবে পরিবর্তন এসেছে, বিভিন্ন শাসনামলের উত্থান-পতন কীভাবে ঘটেছে, কিংবা কীভাবে মানুষের সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। জাদুঘরের এসব উপকরণ ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উৎস হিসেবেও কাজ করে।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: বিশেষভাবে বিজ্ঞান জাদুঘরে প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন নমুনা থাকে। প্রাণী জাদুঘরে মৃত প্রাণীর কঙ্কাল ও কাঠামো রাখা হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞান জাদুঘরে ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন নমুনা, যেমন—জীবাশ্ম, শিলা, খনিজ, মাটি ইত্যাদি থাকে। এ ধরনের জাদুঘরের বিভিন্ন নমুনা নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এসব জাদুঘর একইসঙ্গে জ্ঞানের অগ্রসরতার সাক্ষ্য দেয়।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব: কিছু জাদুঘরে পুরাতন লিপি, পুথি, বইপত্র এসব রাখা হয়। বিভিন্ন সময়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, বাদ্যযন্ত্র, অলংকার, চিত্র, চারু ও কারুশিল্প, মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরি উপকরণ ইত্যাদিও এসব জাদুঘরে থাকে। অতি প্রাচীন উপকরণের মধ্যে আছে প্রাণীর হাড়, চামড়া, শিং দিয়ে তৈরি উপকরণ ইত্যাদি। এ ধরনের জাদুঘরে বিভিন্ন লেখক, শিল্পী ও বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র থাকে। ধর্মীয় উপাসনালয়ের পুরাতন কোনো নমুনাও থাকে। এসব উপকরণ থেকে সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ধরন বোঝা যায়। সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশে এ ধরনের জাদুঘর ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বাংলাদেশে প্রায় ১৩০টি জাদুঘর আছে। এসব জাদুঘরে এমন কিছু উপাদান আছে, যেগুলো প্রচার ও প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকৃষ্ট করা যায়। তাছাড়া সাধারণ ভ্রমণ ও বিনোদনের জায়গা হিসেবেও জাদুঘর জনপ্রিয়। এভাবে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। বিশেষভাবে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হয়।

উপসংহার: সভ্যতা ও ইতিহাস পরিবর্তনশীল। তাই অতীত ও বর্তমানের উপাদানকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তা না হলে নতুন প্রজন্ম ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হবে। জাদুঘর সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার জাতির সামগ্রিক বিকাশে ভূমিকা রাখে।

৫.৩ বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য যাচাই করি

কোনো একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে একটি বিবরণমূলক ও একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা চিহ্নিত করো এবং লেখা দুটি কেটে ‘আমার বাংলা খাতা’য় আঠা দিয়ে লাগাও। এগুলো কেন বিবরণমূলক এবং কেন বিশ্লেষমূণলক রচনা, তা সংক্ষেপে নিজের যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করো। তোমার যুক্তি বন্ধুদের কাছে বলো এবং তাদের মতামত নাও।

সংগৃহীত লেখাটি কেন বিবরণমূলক রচনা?

সংগৃহীত লেখাটি কেন বিশ্লেষণমূলক রচনা?

____

____

____

____

____

____

____

____

৫.৪ বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করি

নিচের তালিকা থেকে একটি বিবরণমূলক রচনা এবং একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। রচনা দুটি 'আমার বাংলা খাতা'য় লেখো। রচনার শিরোনাম নিজের মতো করে তৈরি করে নাও।

ক. বিবরণমূলক রচনার বিষয়:

১. বাংলাদেশের ফসল
২. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
৩. নববর্ষ উদ্‌যাপন
৪. বিজ্ঞান মেলা
৫. ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

খ. বিশ্লেষণমূলক রচনার বিষয়:

৬. বাংলাদেশের অগ্রগতি
৭. কৃষিকাজে বিজ্ঞান
৮. অধ্যবসায়
৯. সময়ের মূল্য
১০. শিশু দিবস

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য পড়ি সাহিত্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

৬.১.১ কবিতা লিখি

তোমার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা কিংবা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় যা তোমার মনে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে একটি কবিতা লেখো। তোমার রচিত কবিতাটি শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারো।

তোমার লেখা কবিতায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, খুঁজে দেখো—

- কোনো বিষয় বা ভাবকে অবলম্বন করে রচিত কি না?
- লাইনগুলোতে অন্ত্যমিল আছে কি না?
- তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায় কি না?
- উপমা আছে কি না?

কবিতা

বিশেষ কোনো বিষয় বা ভাব নিয়ে কবিতা রচিত হয়। কবিতায় প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিমনের আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধি। কবিতার বাক্যগঠন ও ভাষাভঙ্গি গদ্যের বাক্যগঠন ও ভাষাভঙ্গির চেয়ে আলাদা হয়। কবিতার লাইনকে বলে চরণ এবং অনুচ্ছেদকে বলে স্তবক।

বিভিন্ন ধরনের অলংকার ও ছন্দ কবিতার ভাষাকে সুন্দর করে। নিচে কবিতার অলংকার ও ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অলংকার: অলংকার দুই ধরনের: শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দালংকার: কবিতায় প্রতি লাইনের শেষে প্রায়ই অন্ত্যমিল দেখা যায়। এ ধরনের অন্ত্যমিলকে অনুপ্রাস বলে। যেমন: চলি—বলি, হাওয়া—যাওয়া ইত্যাদি। আবার, কখনো কখনো কবিতার চরণের মধ্যে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। যেমন: 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে'—এখানে 'গ' এবং 'র' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই ধরনের পুনরাবৃত্তির নামও অনুপ্রাস। অনুপ্রাস এক ধরনের শব্দালংকার।

অর্থালংকার: কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়। যেমন: 'রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন রুক্ষ মাঠ'—এখানে রুক্ষ মাঠকে ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্য কিছুর সঙ্গে এভাবে তুলনা বা সাদৃশ্য তৈরি করাকে উপমা বলে। উপমা এক ধরনের অর্থালংকার।

ছন্দ: ছন্দ বোঝার জন্য লয়, পর্ব ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

লয় হলো কবিতার গতি। পর্ব হলো কবিতার এক তাল থেকে আরেক তালের মধ্যকার অংশ। আর মাত্রা হলো পর্বের একক। নিচের পদ্যাংশটুকু তাল রক্ষা করে পড়ো এবং খেয়াল করো:

/জল ছাড়িয়ে /দল হারিয়ে /গেলাম বনের /দিক

/সবুজ বনের /হরিৎ টিয়ে /করে রে ঝিক/মিক

/বনের কাছে /এই মিনতি, /ফিরিয়ে দেবে /ভাই,

/আমার মায়ের /গয়না নিয়ে /ঘরকে যেতে /চাই।

উপরের অংশটুকু অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে না পড়লে শ্রুতিমধুর হয় না। পড়ার এই গতির নাম লয়। আবার বাঁকা দাঁড়ির মাঝখানে থাকা 'জল ছাড়িয়ে', 'দল হারিয়ে', 'গেলাম বনের', 'দিক'—এগুলো এক একটি পর্ব। 'জল ছাড়িয়ে' পর্বে ৪ মাত্রা আছে; যথা: জল+ছা+ড়ি+য়ে। একইভাবে 'দল হারিয়ে' পর্বে ৪ মাত্রা: দল+হা+রি+য়ে; 'গেলাম বনের' পর্বে ৪ মাত্রা: গে+লাম+ব+নের এবং 'দিক' ১ মাত্রা।

লয়, পর্ব, মাত্রা বিবেচনায় ছন্দ তিন ধরনের: স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। ছন্দভেদে মাত্রা গণনার ধরন আলাদা হয়ে থাকে।

স্বরবৃত্ত ছন্দ: এটি দ্রুত লয়ের ছন্দ। সাধারণত একেকটি পর্ব হয় ৪ মাত্রার। ছড়ার জন্য উপযোগী বলে একে ছড়ার ছন্দও বলা হয়। যেমন:

/এই নিয়েছে /ওই নিল যা

/কান নিয়েছে /চিলে।

/চিলের পিছে /ঘুরছি মরে

/আমরা সবাই /মিলে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ: এই ছন্দের লয় মধ্যম গতির। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৬ মাত্রার পর্ব হয়। এই ছন্দের মাত্রা-গণনা পদ্ধতি একটু আলাদা। যেমন:

/তোমাতে রয়েছে /সকল কেতাব /সকল কালের /জ্ঞান,

/সকল শাস্ত্র /খুঁজে পাবে সখা /খুলে দেখ নিজ /প্রাণ!

/তোমাতে রয়েছে /সকল ধর্ম, /সকল যুগাব/তার,

/তোমার হৃদয় /বিশ্ব-দেউল /সকলের দেব/তার।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ: এই ছন্দের লয় বা গতি ধীর। সাধারণত প্রতি পর্বে ৮ ও ৬ মাত্রা দেখা যায়। এই ছন্দের মাত্রা-গণনা পদ্ধতিও আলাদা। বর্ণ গুনে গুনেও এর মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যেমন:

/হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে /করেছ মহান!

/তুমি মোরে দানিয়াছ /খ্রিষ্টের সম্মান

/কণ্টক-মুকুট শোভা। /দিয়াছ, তাপস,

/অসঙ্কোচ প্রকাশের /দুরন্ত সাহস;

কবিতা পড়ি ১

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বাংলাদেশের একজন কবি। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে আছে 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'হাস্নাহেনা', 'বনি আদম', 'বিশ্বনবী' ইত্যাদি। নিচের 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি কবির 'বুলবুলিস্তান' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

পল্লি-মা

গোলাম মোস্তফা

পল্লি-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকিয়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

স্নেহময়ী রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তরে;
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গোরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ওই যে পাখির গানের সুখে কাঁপন জাগে বনের বুকে,
মাথাল মাথায় কাস্তে হাতে ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

ওরা সবাই সহজভাবে ঠাঁই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গন্ডগোলে,
গোরু-মহিষ যে ঠাঁই চরে, শালিক তাহার পাশেই চরে
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে কখনো বা নৃত্য করে!

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু বাজায় বেণু অশথ-মূলে
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের খেত ওই উঠল দুলে;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে!

দুপুরবেলায় ক্লান্ত হয়ে রৌদ্র-তাপে কৃষক ভায়া
বসল এসে গাছের ছায়ায় ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ-ছায়া,
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি কচি ওই যে পাতা,
ও যেন মার আপন হাতে তৈরি করা মাঠের ছাতা!

ঘাম-ভেজা তার ক্লান্ত দেহে শীতল সমীর যেমনি চাওয়া,
পাঠিয়ে দিল অমনি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া,
কালো দিঘির কাজল জলে মিটাল তার তৃষ্ণা-জ্বালা,
কোন সে আদি কাল হতে মা রেখেছে এই জলের জালা।

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে,
রঙিন আশার স্বপ্ন এলো নীল নয়নের আকাশ ছেয়ে;
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!

ওই যে লাউয়ের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে
কৃষক-বালা আসছে ফিরে নদীর পথে কলসি পুরে,
ওই কুঁড়েঘর—উহার মাঝেই যে-চিরসুখ বিরাজ করে,
নাইরে সে সুখ অট্টালিকায়, নাইরে সে সুখ রাজার ঘরে!

কত গভীর তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লি-প্রাণে,
জানুক কেহ নাই বা জানুক—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু
মোদের মতো তাই ওরা আর ছোটে নাকো মোহের পিছু।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অশথ: অশ্বত্থ গাছ।

কমল-কলি: পদ্মের মুকুল।

কৃষক-বালা: কৃষক-কন্যা।

চিকুর: চুল।

জাংলা: বাঁশের তৈরি মাচা।

জালা: মাটির বড়ো পাত্র।

টোটা: দূর হওয়া।

ঠাঁই: স্থান, জায়গা।

দিগন্তর: যেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে মনে হয়।

ধেনু: গোরু।

প্রবাস-পথ: বিদেশের রাস্তা।

বাষ্প-রথ: রেলগাড়ি।

বেণু: বাঁশি।

ভুঞ্জিতে: ভোগ করতে।

মোহ: লোভ।

সমীর: বাতাস।

৬.১.২ কবিতার কাঠামো বুঝি

'পল্লি-মা' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.৩ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'পল্লি-মা' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।’—কথাটি বিশ্লেষণ করো।

৩। ‘পল্লি-মা’ কবিতায় কবি গ্রামকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন কেন?

৪। কী কী প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে?

পল্লি-মা’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১. এই কবিতায় গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসী একজন মানুষের মনের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

২. এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি সমিল কবিতা। কবিতাটির প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল আছে।

৩. কবিতাটিতে দুই ধরনের অনুপ্রাস আছে: ক. অন্ত্যমিল অনুপ্রাস: পথে—রথে, সুখে—বুকে ইত্যাদি; এবং খ. পুনরাবৃত্তি অনুপ্রাস: ‘মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে’—এখানে ‘ম’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এগুলো শব্দালংকারের উদাহরণ।

৪. কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ‘মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে’—এখানে পদ্মফুল ফোটাকে মায়ের হাসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫. কবিতাটির লয় দ্রুতগতির।

৬. কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা।

৭. চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/পল্লি-মায়ের /বুক ছেড়ে আজ /যাচ্ছি চলে /প্রবাস-পথে

/মুক্ত মাঠের /মধ্য দিয়ে /জোর-ছুটানো /বাষ্প-রথে।

কবিতা পড়ি ২

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) পল্লিকবি হিসেবে পরিচিত। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'ধানখেত', 'চলে মুসাফির' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিচের 'কবর' কবিতাটি পল্লিকবির 'রাখালী' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো

কবর

জসীমউদ্‌দীন

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।

এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া গেল কারা!
সোনালি উষার সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবিসাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোটো-খাটো তার হাসি-ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
'আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।'
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছ পয়সা করি দেড়ি,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনো হতো না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ির বাটে!
হেসো না—হেসো না—শোনো দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হতো দেখতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে হাসিয়া কহিত, 'এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।'
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, 'আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়!'

তারপর এই শূন্য জীবনে কত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।

শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গনিয়া গনিয়া ভুল করে গনি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে লাগায়ে বুক,
আয়—আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরান যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
'বাজান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।'
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম, 'বাছা শোও',
সেই শোয়া তার শেষ শোয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা 'বাজানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?'
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।

গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহিন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লিবালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, ‘বাছারে যাই,
বড়ো ব্যথা রোলো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।’
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গন্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল—‘আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।’
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরানের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকি-মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, ‘রহমান খোদা! আয়,
ভেস্ত নসিব করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!’

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

আথাল: গোয়াল।

উষা: ভোরবেলা।

কোদাল: মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার।

গন্ড: কপোল।

গলাগলি: আলিঙ্গান।

গহিন: গভীর।

গাঁট: ট্যাঁক।

গোর: কবর।

তামাশা: কৌতুক।

দুনিয়া: পৃথিবী।

দেড়ি: সঞ্চয়।

দোয়া: মঙ্গাল কামনা।

নথ: নাকে পরার অলংকার বিশেষ।

নয়ন: চোখ।

নসিব: ভাগ্য।

নাওয়া: স্নান করা।

নিরালা: নির্জন।

বাট: পথ।

ভেস্ত: বেহেশত।

মাঙা: প্রার্থনা করা।

মাজন: দাঁত পরিষ্কার করার গুঁড়া।

লাঙল: জমি চাষ করার যন্ত্র।

শুনো: শূন্য।

সপ: মাদুর।

৬.১.৪ কবিতার কাঠামো বুঝি

‘কবর’ কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.৫ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'কবর' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। 'যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।'—কথাটি দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৩। ‘কবর’ কবিতায় যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময়ে জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল?

৪। তোমাকে কষ্ট দিয়েছে এমন একটি মৃত্যু-শোকের কথা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো।

কবর’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি কাহিনি কবিতা। কবিতায় একজন বৃদ্ধ পিতামহ তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুর বেদনাদায়ক স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

২. এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি সমিল কবিতা। কবিতাটির প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল আছে।

৩. কবিতাটিতে দুই ধরনের অনুপ্রাস আছে: ক. অন্ত্যমিল অনুপ্রাস: কত—শত, মিশে—দিশে ইত্যাদি; এবং খ. পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস: ‘সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া গেল কারা’—এখানে ‘র’ ও ‘ড়’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এগুলো শব্দালংকারের উদাহরণ।

৪. কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ‘সোনার মতন মুখ’—এখানে মুখকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫. কবিতাটির লয় মধ্যম গতির।

৬. কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।

৭. চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/এইখানে তোর /দাদির কবর /ডালিম গাছের /তলে,
/তিরিশ বছর /ভিজায়ে রেখেছি /দুই নয়নের /জলে।

কবিতা পড়ি ৩

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা, 'নৌফেল ও হাতেম', 'হরফের ছড়া' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'মুহূর্তের কবিতা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি!—পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।

দিক-দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানখেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥

শব্দের অর্থ

অপরূপ: অতুলনীয়।

আবাদি গ্রাম: কৃষিজমি সংলগ্ন গ্রাম।

আভা: দীপ্তি।

কেয়া: ফুল বিশেষ।

তৃষাতপ্ত: পিপাসায় কাতর।

দিক-দিগন্ত: দৃষ্টির শেষ সীমানা।

প্রতীক্ষিত: অপেক্ষারত।

বন্ধুর: অসমান।

বর্ষণ: বৃষ্টি।

বিদগ্ধ: সরস।

মেদুর: কোমল।

সওয়ার: আরোহী।

৬.১.৬ কবিতার কাঠামো বুঝি

'বৃষ্টি' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.৭ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন/ রুক্ষ মাঠ।’—কবি কেন এমন কথা বলেছেন?

৩। রৌদ্র-দগ্ধ ধানখেত কীসের স্পর্শ পেতে চায়? কেন পেতে চায়?

৪। বৃষ্টির সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের সম্পর্ক কী লেখো।

‘বৃষ্টি’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রকৃতির কী অবস্থা থাকে এবং বৃষ্টির ফলে তাতে কোন পরিবর্তন আসে, এই কবিতায় তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২। এটি একটি সনেট কবিতা। সনেট কবিতা ১৪ চরণের হয়ে থাকে। এই চরণগুলো আবার দুটি স্তবকে বিভক্ত—প্রথম স্তবক ৮ চরণের এবং দ্বিতীয় স্তবক ৬ চরণের। এ ধরনের কবিতায় চরণের শেষে বিশেষ ধরনের মিল থাকে। যেমন, ‘বৃষ্টি’ কবিতার প্রথম স্তবকে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৮ম চরণের শেষে এক ধরনের মিল আছে; আবার ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম চরণের শেষে অন্য ধরনের মিল আছে। এছাড়া দ্বিতীয় স্তবকে ৯ম, ১১শ ও ১৩শ চরণে এক ধরনের মিল এবং ১০ম, ১২শ ও ১৪শ চরণে আরেক ধরনের মিল। মিলের এই বিষয়টি ক, খ, গ ও ঘ দিয়ে বোঝানো হলো:

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি!—পদ্মা মেঘনার ক
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়, খ
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়; খ
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার। ক
দিক-দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার ক
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়, খ
রৌদ্র-দগ্ধ ধানখেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়, খ
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। ক

রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন গ
রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর, ঘ
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন, গ
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর, ঘ
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন গ
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥ ঘ

৩। কবিতাটিতে দুই ধরনের অনুপ্রাস আছে: ক. অন্ত্যমিল অনুপ্রাস: সওয়ার—জোয়ার, বন্ধুর—মেদুর ইত্যাদি; এবং খ. পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস: ‘বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।’—এখানে ‘ন’ ও ‘র’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এগুলো শব্দালংকারের উদাহরণ।

৪। কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ‘রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন’—এখানে রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতকে রুক্ষ মাঠের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫। কবিতাটির লয় ধীর গতির।

৬। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা।

৭। চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতী/ক্ষিত বৃষ্টি!—পদ্মা মেঘনার

/দুপাশে আবাদি গ্রামে, /বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,

/বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ /ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;

/বিদ্যুৎ-রূপসী পরি /মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।

কবিতা পড়ি ৪

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) কবিতা, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী', 'ধানকন্যা', 'ভোরের নদীর মোহনায়', 'জাগরণ', 'নরকে লাল গোলাপ' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'মানচিত্র' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা   খোলা তলোয়ার

খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ   যে পদ-প্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার   হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা   সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার ॥

এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহিদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর ॥

শব্দের অর্থ

খুর: গবাদিপশুর পায়ের নিচের অংশ।

গুণ: নৌকা টেনে নেওয়ার দড়ি।

জাগরী: ঘুমহীন।

ঝটিকা: ঝড়

পদাতিক: পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে যে সৈন্য।

পরোয়ানা: লিখিত আদেশ।

প্রপাত: ঝরনা।

ফেনিল: ফেনাযুক্ত।

ভাস্কর: সূর্য।

ভিত: দালানের যে অংশ মাটির নিচে থাকে।

মহনীয়: মহান।

রাজন্য: রাজা।

রামধনুক: রংধনু।

শিখর: চূড়া।

শিলা: পাথর।

সেতার: বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

হাপর: কামারের চুল্লিতে বাতাস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত নলযুক্ত চামড়ার থলে।

৬.১.৮ কবিতার কাঠামো বুঝি

'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.৯ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী/ চারকোটি পরিবার।’—কবি কেন এমন বলেছেন?

৩। এই কবিতাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত? এ সম্পর্কে তুমি আর কী জানো?

____

____

____

____

____

____

স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের সামনে শহিদদের স্মরণে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করে। সেই স্তম্ভটি পাকিস্তানি শাসকচক্র ভেঙে ফেলে। এর প্রতিক্রিয়ায় কবিতাটি রচিত।

২। এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি অমিল কবিতা। কবিতাটির চরণের শেষে মিল নেই।

৩। কবিতাটিতে পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস দেখা যায়: 'ভেঙেছে ভাঙুক ভয় কি বন্ধু'—এখানে 'ভ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এটি এক ধরনের শব্দালংকার।

৪। কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: 'সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক/ শপথের ভাস্কর'—এখানে শপথের আগুনকে প্রজ্বলিত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫। কবিতাটির লয় মধ্যম গতির।

৬। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।

৭। চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/স্মৃতির মিনার /ভেঙেছে তোমার? /ভয় কি বন্ধু, /আমরা এখনো
/চার কোটি পরি/বার
/খাড়া রয়েছি তো! /যে-ভিত কখনো /কোনো রাজন্য
/পারেনি ভাঙতে
/হীরের মুকুট /নীল পরোয়ানা /খোলা তলোয়ার
/খুরের ঝটিকা /ধূলায় চূর্ণ /যে পদ-প্রান্তে

কবিতা পড়ি ৫

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি। 'রাত্রিশেষ', 'ছায়াহরিণ', 'সারা দুপুর', 'আশায় বসতি', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই। নিচের কবিতাটি কবির 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে

আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা—
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরি সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির—সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার—
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা-র
শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।

দুপাশে ধানের খেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

শব্দের অর্থ

অভ্যাগত: অতিথি।

আগন্তুক: নবাগত লোক।

খর: প্রবল।

চিরোল পাতা: চেরা পাতা।

জমিন: ভূমি।

জারুল: গাছ বিশেষ।

নিশিন্দা: গাছ বিশেষ।

নিশিরাইত: গভীর রাত।

স্বাপ্নিক: স্বপ্ন বিষয়ক।

৬.১.১০ কবিতার কাঠামো বুঝি

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৬.১.১১ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘আমি কোনো আগন্তুক নই।’—কেন কবি এমন কথা বলেছেন?

৩। বাংলাদেশের প্রকৃতি তোমাকে কখনো মুগ্ধ করেছে কি না? কখন, কীভাবে মুগ্ধ করেছে?

৪। মনে করো, ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হয়েছে। তখন সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে, কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না। এর ফলে তার মনে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়, তা কীভাবে দূর করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা এই কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

২। এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি গদ্য কবিতা। কবিতায় চরণের শেষে মিল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে এক চরণের মাঝখানে শুরু হওয়া বাক্য পরের চরণে গিয়ে শেষ হয়েছে।

৩। কবিতাটিতে পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস দেখা যায়: 'আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন'—এখানে 'চ', 'জ' ও 'ন' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এটি এক ধরনের শব্দালংকার।

৪। কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: 'জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা'—এখানে জ্যোৎস্নাকে চাদরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫। কবিতাটির লয় ধীর গতির।

৬। কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা। সাধারণ গদ্যের চেয়ে এর বাক্যগঠন আলাদা। আবৃত্তি করার সময়ে এই কবিতার ভাষার মধ্যে এক ধরনের সুর ও সূক্ষ্ম তাল টের পাওয়া যায়।

৭। চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/আসমানের তারা সাক্ষী
/সাক্ষী এই জমিনের ফুল, /এই
নিশিরাইত /বাঁশবাগান /বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
/সাক্ষী এই জারুল জামরুল, /সাক্ষী
পুবের পুকুর, /তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে /স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা /আমাকে চেনে
/আমি কোনো অভ্যাগত নই
/খোদার কসম /আমি ভিনদেশি পথিক নই
/আমি কোনো আগন্তুক নই।

কবিতা পড়ি ৬

নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম ১৯৪৫) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'না প্রেমিক না বিপ্লবী', 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম। নিচের কবিতাটি কবির 'চাষাভূষার কাব্য' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি, মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান,—এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যে রকম, সে রকম দিগন্তপ্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে

এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

উদ্যত: প্রস্তুত।

উন্মত্ত: উত্তেজিত।

দূর্বাদল: দূর্বা ঘাসের পাতা।

প্রদীপ্ত: উজ্জ্বল।

বজ্রকণ্ঠ: বজ্রের ধ্বনির মতো গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

বিবর্ণ: মলিন।

বিমুখ প্রান্তরে: প্রতিকূল পরিবেশে।

ভবঘুরে: অকারণে যারা ঘুরে বেড়ায়।

লালসালু: লাল রঙের মোটা কাপড়।

শোভিত: সজ্জিত।

৬.১.১২ কবিতার কাঠামো বুঝি

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.১৩ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। 'একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষা।'—বিশ্লেষণ করো।

৩। এই কবিতায় 'কবি' হিসেবে কাকে অভিহিত করা হয়েছে? কেন?

৪। ইতিহাসের কোন ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে লেখো।

‘স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপটে কবিতাটি রচিত।

২। এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি গদ্য কবিতা। কবিতায় চরণের শেষে মিল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে এক চরণের মাঝখানে শুরু হওয়া বাক্য পরের চরণে গিয়ে শেষ হয়েছে।

৩। কবিতাটিতে পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস দেখা যায়: ‘একখণ্ড অখণ্ড আকাশ’—এখানে ‘ণ্ড’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এটি এক ধরনের শব্দালংকার।

৪। কবিতায় উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ‘জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে’—এখানে উদ্যানকে সৈকতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অর্থালংকার।

৫। কবিতাটির লয় ধীর গতির।

৬। কবিতাটি গদ্য ছন্দে লেখা। আবৃত্তি করার সময়ে এর মধ্যে এক ধরনের সুর ও তাল টের পাওয়া যায়।

৭। চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/একটি কবিতা লেখা হবে /তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে

/লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর /ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা /বসে আছে

ভোর থেকে /জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: /‘কখন আসবে কবি?’

কবিতা পড়ি ৭

কবিতাটি আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের (১৮৭৪-১৯৬৩) "স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ি ইভিনিং" কবিতার অনুবাদ।

আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) বাংলাদেশের একজন কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'নববসন্ত', 'বিরস সংলাপ', 'হাওয়া তোমার কী দুঃসাহস' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'অন্য ক্ষেতের ফসল' নামের কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে

রবার্ট ফ্রস্ট

অনুবাদ: আবুল হোসেন

মনে হয় জানি, এই বনভূমি কার।
যদিও কাছেই কোনো গ্রামে বাড়ি তার
সে জানল না থেমে আজ এখানে এখন
দেখছি বরফে ঢেকে যায় তার বন।
বছরের সবচেয়ে আঁধার এ সাঁঝে
জমে-যাওয়া হ্রদ আর বনানীর মাঝে
এখানে থামছি কেন ঘোড়াটা আমার
ভাবে, ধারে কাছে কোনো নেই তো খামার।

লাগামের ঘণ্টি নেড়ে, মাথা করে নিচু
সে যেন শুধায়, ভুল হয়েছে কি কিছু!
আর কোনো শব্দ নেই, কেবল বাতাস
বয় ধীরে, বরফের কুচি ফেলে শ্বাস।

এমন সুন্দর বন গহন, কী ঘন!
আমার যে কাজ বাকি প্রচুর এখনো।
ঘুমের আগেই যেতে হবে বহু দূর
ঘুমের আগেই যেতে হবে বহু দূর।

শব্দের অর্থ

সাঁঝ: সন্ধ্যা।

বনানী: বিশাল বন।

লাগাম: ঘোড়ার মুখে লাগানো দড়ি।

ঘণ্টি: ছোটো ঘণ্টা।

শুধানো: জিজ্ঞাসা করা।

কুচি: টুকরা।

গহন: গভীর।

৬.১.১৪ কবিতার কাঠামো বুঝি

'বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে' কবিতাটি পড়ার পর নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথম কলামের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দ্বিতীয় কলামে লেখো। এ কাজের জন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সহায়তা নাও।

জিজ্ঞাসা	জবাব
অনুপ্রাসের উদাহরণ	
উপমার উদাহরণ	
লয়ের প্রকৃতি	
ছন্দের ধরন	

৬.১.১৫ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘ঘুমের আগেই যেতে হবে বহু দূর।’—কথাটির তাৎপর্য আলোচনা করো।

৩। এই কবিতাটির পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও।

‘বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। এটি একটি অনুবাদ-কবিতা। এই কবিতায় বাধা-বিপত্তি ও বিরূপ পরিস্থিতি পার হয়ে এগিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে।

২। এটি কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত একটি সমিল কবিতা। কবিতাটির প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল আছে।

৩। কবিতাটিতে দুই ধরনের অনুপ্রাস আছে: ক. অন্ত্যমিল অনুপ্রাস: কার—তার, সাঁঝে—মাঝে ইত্যাদি; এবং খ. পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস: ‘এমন সুন্দর বন গহন, কী ঘন!’—এখানে ‘ন’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এগুলো শব্দালংকারের উদাহরণ।

৪। কবিতাটিতে উপমার ব্যবহার নেই। তবে, এক ধরনের তুলনা আছে। যেমন, ‘বরফের কুচি ফেলে শ্বাস’—এখানে বরফের কুচি প্রাণীর মতো শ্বাস ফেলছে। এ ধরনের অর্থালংকারের নাম সমাসোক্তি। সমাসোক্তি অলংকারে বস্তুকে প্রাণীর মতো মনে করা হয়।

৫। কবিতাটির লয় ধীর গতির।

৬। এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা।

৭। চরণগুলোর পর্ব-বিন্যাস এ রকম:

/মনে হয় জানি, এই /বনভূমি কার।

/যদিও কাছেই কোনো /গ্রামে বাড়ি তার

/সে জানল না থেমে আজ /এখানে এখন

/দেখছি বরফে ঢেকে /যায় তার বন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৬.১.১৬ কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই করি

এই পরিচ্ছেদে তোমরা মোট সাতটি কবিতা পড়েছ। কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথমটির নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো। কাজটি প্রথমে নিজে করো; তারপর সহপাঠীদের সঙ্গে মেলাও।

কবিতা	বিষয় (কাহিনি-নির্ভর/ ভাব-নির্ভর)	গঠন (সমিল/ অমিল)	অন্ত্যমিল অনুপ্রাস ও পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস (আছে/নেই)	উপমা (আছে/ নেই)	লয় (দ্রুত/ মধ্যম/ ধীর)	ছন্দ (স্বরবৃত্ত/ মাত্রাবৃত্ত/ অক্ষরবৃত্ত)
পল্লি-মা	কাহিনি-নির্ভর	সমিল	অন্ত্যমিল অনুপ্রাস: আছে পুনরাবৃত্ত অনুপ্রাস: আছে	আছে	দ্রুত	স্বরবৃত্ত
কবর						
বৃষ্টি						
স্মৃতিস্তম্ভ						
আমি কোনো আগন্তুক নই						
স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো						
বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে						

৬.১.১৭ কবিতা লিখি ও যাচাই করি

একটি বিষয় নির্ধারণ করে সেই বিষয় নিয়ে সমিল বা অমিল একটি কবিতা রচনা করো। তোমাদের লেখা কবিতাগুলো নিয়ে শ্রেণিতে একটি 'কবিতা পাঠের আসর' করো।

২য় পরিচ্ছেদ

গল্প

৬.২.১ গল্প লিখি

তোমার দেখা বা শোনা কোনো ঘটনা অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো। লেখা হয়ে গেলে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের গল্প নিয়ে আলোচনা করো।

তোমার লেখা গল্পের ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

- তোমার গল্পের বিষয় কী?
- গল্পের কাহিনি কী নিয়ে?
- গল্পে কী কী ঘটনা ঘটেছে?
- গল্পে কোন কোন চরিত্র আছে?
- চরিত্রের মুখের সংলাপগুলো কোন ভাষারীতিতে লেখা?

গল্প কী

বাস্তব বা কাল্পনিক বিষয় নিয়ে গদ্য ভাষায় রচিত কাহিনিকে গল্প বলে। গল্পের কাহিনির মধ্যে এক বা একাধিক ঘটনা থাকে। ঘটনা তৈরি হয় চরিত্রের বিভিন্ন রকম কাজকর্ম ও ভূমিকার মধ্য দিয়ে। গল্পের চরিত্রকে জীবন্ত করার জন্য চরিত্রের মুখে প্রায়ই সংলাপ যোগ করা হয়।

গল্পের এক বিশেষ শ্রেণিকে বলে ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের আয়তন সাধারণত ছোটো হয়। ছোটোগল্পের কাহিনি যে কোনো ঘটনা থেকে শুরু হতে পারে, আবার হঠাৎ করে শেষ হয়ে যেতে পারে। ছোটোগল্প পড়ার পরে পাঠকের কিছুটা অতৃপ্তি তৈরি হতে পারে—মনে হতে পারে আরেকটু পড়তে পারলে ভালো লাগত।

গল্প পড়ি ১

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) বাংলাদেশের একজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'ঘর ভাঙা ঘর', 'উত্তর পুরুষ', 'রক্তের অক্ষর', 'বং থেকে বাংলা' ইত্যাদি। নিচে লেখকের 'অলিখিত উপাখ্যান' উপন্যাসের খানিক অংশ দেওয়া হলো।

অলিখিত উপাখ্যান

রিজিয়া রহমান

অরণ্য কেটে বসতি স্থাপন করছে মানুষ। সুন্দরবনের দীর্ঘ গাছের ডালপালার জটাজাল সূর্যকে বর্ম-ঢাকা সেনাদলের মতো প্রতিহত করে। আলো ঢুকতে পারে না স্যাঁতসেঁতে মাটির বুকে। হিন্তাল বনে ব্যাঘ্র পরিবার

নির্বিঘ্নে বিচরণ করে। বন্য শূকর, নীলগাই, বুনো মহিষেরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। হরিণের পালের খুরের শব্দ তীব্র গতিতে বাতাসের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে। জোয়ার স্ফীত আরণ্যক নদীর কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়। গাছের ডালে শরীর জড়িয়ে মাথা দোলায় অজগর। বিচিত্র ভয়াল সুন্দরবন। সেখানে বেজে ওঠে উপনিবেশবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর। অসংখ্য কুঠারের শব্দ বনের পশুকে সচকিত করে। জঙ্গলে ঝড় তুলে ছুটে পালায় হরিণের দল।

দুপুরের সূর্যের আলো বনের মধ্যে ঢুকতে না পারলেও তার আভায় বনভূমি আলোকিত। হাতির পিঠে দুলতে দুলতে জঙ্গল কাটার কাজ তদারক করছিল হেনরি। অনেকদিন হয়ে গেল সে লোকজন নিয়ে জঙ্গল কাটতে এসেছে। সঙ্গে এসেছে হাতি মহারাজ। তাঁর প্রিয় ঘোড়া হাওয়ার্ড। আরো এসেছে পঞ্চাশ জন মজুর। এরা সবাই মোরেলদের কয়েদখানার কয়েদি। কয়েদিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেইজন্য প্রত্যেকের পায়ে পরানো আছে লোহার শিকল। এছাড়া রয়েছে ঠিকাদার। আর আছে মোহন খাঁ। যাকে কয়েদিরা সাহেবের চেয়েও বেশি ভয় পায়। অবাধ্যদের শাস্তি দেবার ভয়াবহ নৃশংস সব কলাকৌশল জানা আছে তার। দিনকয়েক আগে কয়েকজন কয়েদি জঙ্গল কাটা ফেলে মধুর চাক ভাঙতে গিয়েছিল, কঠিন শাস্তি দিয়েছিল মোহন খাঁ। মৌচাকের নিচে আগুনের ধোঁয়া দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল মৌমাছিদের। আর সেই ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অপরাধীদের। মৌমাছির কামড়ে পরদিন তাদের চোখ-মুখ-শরীর ফুলে এমন বীভৎস চেহারা হয়েছিল যে, হেনরিই তাদের চিনতে পারেনি। দুদিন আগে এক কয়েদি জঙ্গল কাটা ফেলে বসেছিল। ঠিকাদারের চাবুক পড়েছিল তার ওপরে। ঠিকাদার চাবুক মারতে মারতে চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছিল—তোদের কি এখানে বসে হাওয়া খাবার জন্য আনা হয়েছে! নবাবের মতো হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছিস!

কয়েদিটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—বড়ো পানির পিপাসা। সারাটা দিনে মাত্র তিনবার খাবার পানি পাই। তেষ্টায় যে বুকটা শুকিয়ে থাকে। কুড়োল চালাতে পারি না।

ঠিকাদার খেঁকিয়ে উঠেছে—ওঃ কী আমার নবাবপুত্তুর রে! ঘণ্টায় ঘণ্টায় পানির গেলাস চাই। জানিস, মিঠা পানি কত দূর থেকে আনতে হয়?

লোকটাকে পানি দেওয়া হয়নি। দুদিন পর পর লোক পাঠিয়ে দূরের গ্রামের দিঘি থেকে ভারায় করে খাবার পানি আনতে হয়। সুতরাং বেহিসেবি খরচ করে পানি শেষ করলে এই লবণাক্ত এলাকায় খাবার পানি পাওয়া যাবে কোথায়! লোকটাকে লাথি মেরে দাঁড় করিয়ে দিল ঠিকাদার—ওঠ, গাছ কাট।

কিছুটা দূরে তাঁবুতে বসে হেনরি বন্দুক পরিষ্কার করছিল। ডেকে জিজ্ঞসা করল—এই ঠিকাদার! কী হয়েছে? গোলমাল কেন ওখানে?

দোর্দণ্ড প্রতাপের ঠিকাদার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে আভূমি নত হয়ে গেল—দেখুন হুজুর! এই ব্যাটা কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে আরাম করছে। ঘড়ি ঘড়ি আবার পানি চাই নবাবজাদার।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

হেনরি বন্দুক থেকে চোখ না তুলে বলল—এত মিঠা পানি দেয়া যাবে না। টাইমের আগে কেউ পানি পাবে না।

তখনি চাকর বড়ো গ্লাসে পানি এনে ধরল হেনরির সামনে। হেমন্ত শেষ হয়ে গেছে। তবু এই বনের মধ্যে ভ্যাপসা গরম! বন্দুক সাফ করতে করতে হেনরি ঘেমে উঠেছিল। পানির গ্লাসটা মুখের কাছে ধরতেই দেখল, দূর থেকে তৃষ্ণার্ত কয়েদিটা কেমন লোলুপ জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেনরির পানির গ্লাসের দিকে। মাথাচাড়া দিল বিবেক। আর বোধ হয় সেই বিবেকের নির্দেশকে অবদমিত করবার জন্য ভীষণ রাগ উঠল হেনরির শরীর বেয়ে। রাগবিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল হেনরি মোরেল—ঠিকাদার!

ঠিকাদার ছুটে এলো—হুজুর।

হেনরি এক চুমুকে পানির গ্লাস শূন্য করে বলল— ওকে ধরে নদীর পানি খাইয়ে দাও।

ঠিকাদার শিকল পরা লোকটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল খালের পাড়ে—খা। এই খালের পানি খেয়ে তোর বুক ঠান্ডা কর।

লোকটাকে চেপে ধরে সুন্দরবনের ঘোলা লবণাক্ত পানির কাছে নিয়ে গেল ঠিকাদার। কিছুটা ভয়ে এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণায় সেই কাদাঘোলা লবণ বিস্বাদ পানি আঁজলা ভরে খেল লোকটা।

চমৎকার আত্মপ্রসাদে তাঁবুর দড়ির বোনা চেয়ারে বসে হাসল হেনরি মোরেল। এইসব ঠিকাদার, মোহন খাঁ, দুর্গাচরণ আর মোরেলদের পোষা লাঠিয়াল পাইক বরকন্দাজদের মতো আজ্ঞাবহ দাসবৎ লোকগুলো আছে বলেই স্বল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ, এই বিরাট দেশকে পদানত করে রাখতে পেরেছে।

সারা বন কুড়ালের শব্দে মুখর। হিন্তাল হোগলা আর উলুখড়ের বন নিঃশেষ হচ্ছে। বড়ো বড়ো গাছ কুড়ালের ক্রমাগত আঘাতে প্রাচীন ডাইনোসরের মতো আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে। এগিয়ে চলেছে মানুষ। এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। এখানে মোরেলদের আবাদ চলবে। ফসল ফলবে। গড়ে উঠবে মনুষ্য বসতি। মহারাজ গলার ঘণ্টার শব্দ ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। আবাদি এলাকার কাজ পরিদর্শনে বেরিয়েছে সাহেব হেনরি। আগে-পিছে ঘোড়ায় চলছে মোহন খাঁ আর কালু বাওয়ালি। কালু বাওয়ালি নামকরা শিকারি । একবার বাঘের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করছিল সে। দুপাশে কয়েদিরা একজন ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে গাছ কাটছে। কুড়ালের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে শব্দ তুলছে তাদের পায়ের শিকল। হেনরি হাতির ওপর বসে বলল—এই! আজকের মধ্যে এই এলাকাটা সাফ করতে হবে। বুঝলি?

বশংবদ ঠিকাদার মাথা কাত করে বলল—আজ্ঞে হুজুর।

তারপর কাঠ কাটা দলের ওপর চাবুক ঘোরাল—হাত চালা। হাত চালা সব।

শৃঙ্খলিত মানুষগুলোর হাতের কুঠার আঘাত করছে বনভূমির নিস্তব্ধতায়। ফটকের সামনে এলো হেনরি। জঙ্গলে এসে প্রথমেই এই বাসস্থান তৈরি করিয়েছে সে। অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। বড়ো বড়ো

সুন্দরী গাছ দিয়ে বিশ ফুটের মতো উঁচু বেড়ায় ঘিরে ফেলা হয়েছে চারদিক। কোনো বন্য জীব-জন্তু সুন্দরী গাছের বেড়ার দেয়াল টপকে যাতে ভেতরে ঢুকতে পারে না। এর মধ্যেই গোলপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কয়েদিদের থাকবার চালা। ঠিকাদারদের ঘর। মহারাজ আর হাওয়ার্ডের আস্তাবল। ফটকের ভেতর ঢুকে মহারাজ হাঁটু মুড়ে বসল। পিঠের ওপর থেকে নেমে পড়ল হেনরি। কাঠের তৈরি বিরাট ফটক সন্ধ্যার আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়। লম্বা ভারী দুটো গাছ আড়াআড়ি করে হুড়কোর মতো বেঁধে দেয়া হয় ভেতর থেকে। সুন্দরবনের পাজি জানোয়ার বন্য মহিষের দল অবশ্য ভয়ংকর শক্তিশালী। একজোট হয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করলে ফটক ভেঙে পড়তে পারে। তাই কয়েদিরা পালা করে সারা রাত বসে ফটকের কাছে আগুন জ্বালিয়ে পাহারা দেয়। বন্য জন্তুর সাড়া পেলে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে চিৎকার করে। তাঁবুতে এসে ঢুকতেই একজন ঠিকাদার ছুটে এলো—সাহেব হুজুর! এদিকে যে মহা বিপদ হয়েছে।

হেনরি ফিরে দাঁড়াল—কী হয়েছে?

ঠিকাদার চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলল—হুজুর, পশ্চিম দিকের বনে কয়েদিরা কাজ করছিল। ঝোঁপের ভেতর থেকে একটা দাঁতাল বুনো শুয়োর বেরিয়ে একজন কয়েদির উরু চিরে ফেলেছে। সবাই হৈ হৈ করে ওঠায় শুয়োরটা পালিয়েছে। এখন কয়েদিরা কাজ করতে ভয় পাচ্ছে। ওদের পায়ে শিকল লাগানো, ছুটতে পারে না। গাছে উঠতে পারে না। খুব ভয় পাচ্ছে ওরা। আর যে লোকটার উরু চিরে গেছে সে তো অজ্ঞানের মতো পড়ে আছে। ভীষণ রক্ত ঝরছে।

হেনরি চিন্তিত হলো। ঘটনাটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। দু-চারজন ঠিকাদারের হাতে বন্দুক দিয়েছে বটে হেনরি, তবে সেটাও কতটা নিশ্চিন্ত হবার মতো কে জানে। বন্দুক যতটা না বন্য জন্তু মারবার জন্য তার চেয়ে বেশি কয়েদিদের ভয় দেখাবার জন্য। বাঘ, বুনো মহিষ, বন্য শূকর আশেপাশেই রয়েছে। জঙ্গালে আসবার কয়েক দিনের মধ্যেই তো গোটা পাঁচ-সাত কয়েদি শেষ হয়েছে। দুজনকে সাপে খেয়েছে, একজনকে খালের পাড় থেকে কুমিরে টেনে নিয়েছে। বুনো মহিষ শিঙে বাঁধিয়ে নিয়ে গেল একজনকে। আর দুজনকে হিন্তাল বন কাটবার সময়ে বাঘে ধরেছে! কিন্তু কী করা যায়। এমনিতেই মজুরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তার ওপর পায়ের শিকল খুলে দিলে তো সব কটাই পালাবে। মজুরদের কাটা বড়ো বড়ো গাছ পেছনে বেঁধে টেনে আনছে মহারাজ। সেদিকে তাকিয়ে হেনরি গম্ভীর হয়ে বলল—আজ ঐ সেকশানের কাজ বন্ধ থাক। যার পা কেটেছে, সে লোকটা কোথায়?

ঠিকাদার বলল—ওখানেই পড়ে আছে। হেনরি খুব বিরক্ত হলো। সে এসেছে অ্যাডভেঞ্চার আর স্পোর্টসের নেশায়। তার মধ্যে এসব কী ঝঞ্ঝাট। হেনরি মোহন খাঁকে আর কালু বাওয়ালিকে পাঠিয়ে দিল লোকটাকে চালায় নিয়ে আসবার জন্য। ওরা চলে যেতেই দড়ির চেয়ারটায় বসে পড়ল। চাকরকে হুকুম করল খানা লাগাতে। দড়ির চেয়ারের সামনে দুটো তক্তা বিছিয়ে খানার টেবিল লাগাল চাকর। দুজন চাকর হেনরির আদরের ঘোড়া হাওয়ার্ডের দলাইমলাই করছে। মহারাজকে একটা আস্ত কলাগাছ দেয়া হয়েছে খেতে। এদিকে

কলাগাছ পাওয়া যায় না। বনের ধারে বাওয়ালিদের যে গ্রাম আছে। সেটাও এখান থেকে দুই ক্রোশ। হেনরির লোকেরা সেখান থেকে মজুরদের রেশন, পানীয় জল, ঘোড়ার দানা আর কলাগাছ সংগ্রহ করে আনে। দুপুরের শেষ প্রহরেই বনের চারধারে ছায়া ছায়া অন্ধকার নেমেছে। মজুরদের চালাঘরের সামনে মাটির চুলো করে বড়ো হাঁড়িতে চাল-ডাল মিলিয়ে মজুরদের খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। একবারই রান্না করা হয়। রাতে খাবার পর বাসি খিচুড়ি সকালে খেয়ে সবাই কাজে যায় । লাঞ্চের পর পা ছাড়িয়ে শরীর এলিয়ে দিল হেনরি ।

তাঁবুর পরদার সামনে মোহন খাঁ এসে দাঁড়াল। সাহেব ঘুমিয়েছেন মনে করে সে চলে যাচ্ছিল। হেনরি চোখ খুলে ডাকল কী খবর মোহন খাঁ?

মোহন ভেতরে এলো—সাহেব। লোকটা বোধ হয় বাঁচবে না। পায়ের দুধারের মাংস বেরিয়ে পড়েছে, রক্তও থামছে না। কী করা যায় এখন!

হেনরি বলল—কী করা যাবে আর । মরে গেলে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

মোহন বলল—কালু অবশ্য কীসব লতা-পাতার রস লাগিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার আর একটাকেও আজ বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। বোধ হয় আগের বাঘটাই মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, এখন রোজই মানুষ ধরবে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দলে দলে মজুরেরা পায়ের শিকলের শব্দ তুলে ফটক দিয়ে ঢুকছে। কুড়াল হাতে ধরা কালো লোকগুলোর মুখে ভীষণ আতঙ্কের ছাপ।

হেনরি বলল—তাহলে কী করা যায় বলো মোহন খাঁ। যতটুকু জঙ্গল কাটবার প্ল্যান নিয়ে এসেছি আমরা, তার চার আনাও তো কাটা হয়নি। এখন কাজ বন্ধ করে রাখা তো ঠিক হবে না।

মোহন প্রবল আপত্তিতে মাথা ঝাঁকাল—না না কাজ বন্ধ করা যাবে না। দরকার হলে ফিরে গিয়ে আরো কিছু লোক ধরে আনব আমরা।

বাইরের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জঙ্গল থেকে জীবজন্তুর বিচিত্র সব ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মেঘ গর্জনের মতো শব্দ করে বাঘ ডাকল। হেনরি আর মোহন খাঁ দুজনেই সচকিত হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল। মোহন বলল—বাঘটা বোধ হয় শিকার নিয়ে ধারে-কাছেই আছে।

হেনরি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল—বাঘটাকে শিকার করতে হবে। ম্যান ইটার যখন হয়ে গেছে, তখন ঘন ঘন হানা দেবে। কাল সকালে চলো, কোনো চিহ্ন দেখতে পাই কিনা। তাহলে মাচা বাঁধব।

শব্দের অর্থ

অবদমিত: দমন করা হয়েছে এমন।

অ্যাডভেঞ্চার: অভিযান।

আঁজলা: জোড়বদ্ধ দুই হাতের তালু।

আজ্ঞাবহ: অনুগত।

আত্মপ্রসাদ: আত্মতৃপ্তি।

আরণ্যক: বন সম্পর্কিত।

আস্তাবল: ঘোড়া রাখার ঘর।

উপনিবেশবাদী: অন্য দেশ দখল করার মানসিকতা-সম্পন্ন।

কয়েদখানা: জেলখানা।

কয়েদি: কারাগারে বন্দি ব্যক্তি।

কুড়াল: কুঠার।

ক্যানেস্তারা: টিনের তৈরি চারকোনা বাক্স।

ক্রোশ: সোয়া তিন কিলোমিটার।

খাটিয়া: এক ধরনের খাট।

গোলপাতা: তৃণজাতীয় উদ্ভিদ।

ঘড়ি ঘড়ি: বারে বারে।

জটাজাল: ঘন বিন্যস্ত।

ঝঞ্ঝাট: ঝামেলা।

ঠিকাদার: চুক্তিভিত্তিতে কাজ সম্পাদনকারী।

তক্তা: কাঠের ফালি।

তদারক: দেখাশোনা।

দাসবৎ: দাসের মতো।

দোর্দণ্ড: প্রবল।

নৃশংস: নিষ্ঠুর।

পাইক: লাঠিয়াল।

ফটক: দরজা।

বরকন্দাজ: বন্দুকধারী সেপাই।

বর্ম: অস্ত্রের আঘাত প্রতিরোধক দেহাবরণ।

বাওয়ালি: সুন্দরবনের কাঠ সংগ্রহ করা যাদের পেশা।

বিস্বাদ: স্বাদহীন।

বীভৎস: বিকৃত।

ভয়াল: ভয়ংকর।

মোরেল: ব্রিটিশ পদবি বিশেষ।

রাগবিকৃত: রাগে উত্তেজিত।

লাঠিয়াল: লাঠি চালনায় দক্ষ ব্যক্তি।

শ্বেতাঙ্গ: সাদা চামড়ার মানুষ।

সেকশান: নির্দিষ্ট এলাকা।

স্ফীত: ফুলে উঠেছে এমন।

হিন্তাল: গাছ বিশেষ।

হুড়কো: দরজার খিল।

৬.২.২ গল্পের কাঠামো বুঝি

'অলিখিত উপাখ্যান' গল্পটির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সহপাঠীদের উত্তরের সাথে মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

গল্পটির বিষয় কী?	
গল্পের কাহিনি কী নিয়ে?	
গল্পে কী কী ঘটনা ঘটেছে?	
গল্পে কোন কোন চরিত্র আছে?	
চরিত্রের মুখের সংলাপগুলো কোন ভাষারীতিতে লেখা?	

৬.২.৩ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'অলিখিত উপাখ্যান' গল্পটি কোন সময়ের ও কোন প্রেক্ষাপটে লেখা?

২। গল্পে উপনিবেশবাদী কারা? তারা কীভাবে স্থানীয় মানুষের উপর অত্যাচার করেছে?

৩। ‘বড়ো বড়ো গাছ কুড়ালের ক্রমাগত আঘাতে প্রাচীন ডাইনোসরের মতো আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে।’— আলোচনা করো।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়?

গল্প পড়ি ২

সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭) বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'যাপিত জীবন', 'যুদ্ধ', 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'মানুষটি' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি লেখকের 'আকাশপরি' উপন্যাসের অংশবিশেষ।

আকাশপরি

সেলিনা হোসেন

মেয়েটি মায়ের কপালে হাত রেখে আলতো স্বরে ডাকে, ওঠো। আর কত ঘুমুবে।

মা ভীষণ আদরের অনুভবে পাশ ফিরে শোয়। মেয়েটি আবার ডাকে। বলে, ওঠো ভোর হয়েছে। ভোরের আলো দেখবে না? তুমি না ভোরের আলো ভীষণ ভালোবাসো।

—হ্যাঁ, ভীষণ ভালোবাসি। আমি ভোরের আলো দেখব। রোজ ভোরেই তো দেখতে চাই। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

—ছাদে এসো। আমি যাচ্ছি।

মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কিন্তু পাশে কেউ নেই। কে ডাকল তাকে? মা চোখ মুছে চারদিকে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায়, কে তাকে ডেকেছে। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছাদে উঠে আসে।

—বাহ্, কী অপূর্ব আলো। স্নিগ্ধ, নরম।

মা নিজেকে বলে। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

মা চারদিকে তাকায়। বলে, আমি তো ঐ আলোর ভেতর তোমাকে দেখতে পাই। তুমি কি আছ?

মেয়েটি কথা বলে না। স্নিগ্ধ বাতাস মাকে ছুঁয়ে যায়। মা দুহাতে মুখ ঢাকে। তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

—কেঁদো না। মেয়েটির কণ্ঠ।

—এভাবে ছুঁয়ে গেলে তো হবে না। আমি তো তোমাকে দেখতে চাই।

—আমি এভাবেই তোমার কাছে থাকি। আমি তো জানি তুমি টের পাও কখন আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াই।

—পাই, পাই।

মা চোখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। মাঝে মাঝে চোখের ওপর রেগে যায় সে, এত জল কোথা থেকে আসে এই চোখে। জল ফুরোয় না কেন? এসব ভাবলে জল আরো দ্বিগুণ বেগে বের হয়। মেয়েটা তখন কড়া স্বরে ধমক দিয়ে বলে, তুমি এত ফ্যাঁচফ্যাঁচ করো কেন বলো তো! মায়ের কণ্ঠে উত্তর নেই। মা উত্তর দিতে জানে না। মা কান্নার বেগ সামলানোর জন্য রেলিং ধরে ঝুঁকে থাকে।

তখন বাড়ির সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। যে যার কাজে যাবার জন্য রেডি হবে। মায়েরও এখন অনেক কাজ। সবাইকে নাশতা দিতে হবে। নিজের অফিসে যেতে হবে। যাবার পথে শিশু হাসপাতালে যেতে হবে তপুকে দেখতে। ওর ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে। এটা নিয়ে মা ভীষণ চিন্তায় আছে। যদিও ডাক্তার বলেছে, তপু বিপদমুক্ত, কিন্তু মায়ের ভাবনা কাটে না।

মা চোখের জল মুছে রান্নাঘরে যায়। চটপট অনেকগুলো স্যান্ডউইচ বানায়। ঘড়ি দেখে। স্যান্ডউইচের প্লেটটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলে যাবার সময়ে থমকে দাঁড়ায় মা। বুক ভেঙে যায়। টেবিলের একটি চেয়ারে মেয়েটি আর এসে বসে না। ঐ একটি চেয়ার ওর প্রিয় জায়গা ছিল। ওই চেয়ারটিতে না বসলে নাকি ওর ভাত খাওয়া হতো না। এখন কোন চেয়ারে বসে ও ভাত খায়? এই ভাবনার মাঝে মা স্যান্ডউইচের প্লেট হাতে নিয়ে হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন চেয়ারটার একটি পা নেই।

যেন পা-হীন চেয়ারটাকে কেউ সুইরজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের জাতিসংঘ দপ্তরের ভবনগুলোর সামনে রেখে দিয়েছে। মায়ের মনে হয়, সে তার মেয়েটিকে নিয়ে সেই ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে মিলে হাঁ করে বিশাল চেয়ারটাকে দেখছে।

মায়ের কানে মেয়েটির কণ্ঠ বাজে, কী ভাবছ মা?

—তুমি আর আমি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলাম, সে কথা মনে পড়ছে।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। মায়ের কানে সে হাসি বড়ো মধুর লাগে। মা বুঝতেই পারে না যে অন্য ঘরে এষা ওর বাবার সঙ্গে মজা করছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মায়ের মনে হয় চেয়ারটা দেখতে দেখতে সে শক্ত করে মেয়েটির হাত চেপে ধরেছে। মেয়েটি একদিন ওকে বলেছিল, জানো মা আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ভীষণ মূল্যবান। আমার একটি পা না থাকলে আমি আর প্লেন চালাতে পারব না।

মেয়েটি আবার বলে, তুমি ঐ চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছো কেন আমি জানি।

—জানবেই তো। তুমি তো আমাকে বলেছ ভূমিমাইন নিষিদ্ধ করার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও পেতে রাখা ভূমিমাইন বিস্ফোরণে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে কিংবা পঙ্গু হচ্ছে। এই বিশাল চেয়ারটি ভূমিমাইন পেতে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। শুধু তাই নয়, এটা রাখা হয়েছে তাদের স্মরণে যারা ভূমিমাইন বিস্ফোরণে মরে গেছে কিংবা পঙ্গু হয়েছে। কারা যেন স্লোগান দিচ্ছে ‘মাইনমুক্ত পৃথিবীর জন্য লড়ে যেতে চাই।’

মায়ের মনে হয় সে ওই স্লোগানটি শুনতে পাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটিও স্লোগান দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে মেয়েটি বলে, তুমি স্লোগানটি দিচ্ছ না কেন মা?

—তোমার কণ্ঠ শুনতে আমার ভালো লাগছে। স্লোগানটি দেওয়ার সময়ে তুমি যে অন্যরকম হয়ে যাও তা দেখতে আমার ভালো লাগছে। আমাকে দেখতে দাও।

—ঠিক আছে দেখো, কিন্তু আমি যখন এই পৃথিবীতে থাকব না, তখন কিন্তু তুমি আমার হয়ে স্লোগানটি দিও।

মা আঁতকে উঠে বলে, না, এমন কথা বলবে না। তুমি থাকবে না কেন?

—আমি তো আকাশপরি হয়ে যাবো মা। তখন দূর থেকে দেখব পৃথিবী মাইনমুক্ত হয়েছে। ঘটে যাওয়া যুদ্ধের পরেও পেতে রাখা মাইনের কারণে কেউ হারাচ্ছে পা, কিংবা জীবন।

—এসব কী বলছ তুমি? তখন আমি তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারব তো?

—ছোটোবেলা থেকে কত না পরির গল্প শুনেছো তাকে কি ছুঁয়ে দেখতে পেরেছ?

—ওহ্‌মাগো, আমি চাই না এমন দিন আমার জীবনে আসুক। আমি তোমাকে বুকের মধ্যে ধরে রাখতে চাই।

মায়ের শরীর থরথর করে কাঁপে। হাত থেকে পড়ে যায় স্যান্ডউইচের থালা।

ছুটে আসে এষা আর ওর বাবা।

—কী হয়েছে তোমার?

মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ওরা মাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

মা বিকেলে তপুকে দেখতে শিশু হাসপাতালে যায়। তপু মায়ের বান্ধবীর ছেলে। গিয়ে দেখে তপুর বিছানা শূন্য। ওখানে অন্য রোগী। মা ভাবে, তপু বোধহয় ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেছে। মা ওয়ার্ডের চারদিকে তাকায়। দিনের বেলায়ও ডেঙ্গু জ্বরে অসুস্থ বাচ্চাদের মশারির ভেতরে রাখা হয়েছে। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে হাসপাতালের

ওয়ার্ড। মাকে ওই বেডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশের বেডের মহিলা জিজ্ঞেস করে, আপনি কাউকে খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, এই বেডে তপু নামে একটা বাচ্চা ছিল।

—ঘণ্টা দুয়েক আগে ও মারা গেছে।

—মারা গেছে?

মায়ের মাথা ঘুরে উঠলে কিছু একটা ধরার জন্যে হাত বাড়ায়। তখন সেই মহিলা তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলে। টুল টেনে বসতে দেয়। বলে, কিছুক্ষণ আগে সবাই লাশ নিয়ে বাড়ি গেছে।

মা কথা বলতে পারে না। মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মহিলা জিজ্ঞেস করে, রোগী আপনার কী হয়?

—বান্ধবীর ছেলে।

—এখন আপনার বান্ধবীর বাড়িতে যাবেন?

—যাব। যেতেই তো হবে। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বলে, না, না, যাব না।

—কেন যাবেন না?

—এখন কেউ মারা গেলে সেখানে আর আমি যেতে পারি না।

—কেন?

—আমার মেয়েটি যে আকাশপরি হয়েছে।

—মানে? মহিলা অবাক হয়ে তাকায়। মা মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে চলে আসে। মহিলার কথার জবাব দেয় না। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলে, ফজলু তুমি আমাকে আমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাও। ফজলু বুঝে যায় কোথায় যেতে হবে। ও মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে আসে।

মা ওর মাথার দিকে পুঁতে রাখা বাঁশের উপর হাত রেখে বলে, তুমি ভালো আছ তো? মেয়েটির কণ্ঠ, হ্যাঁ, ভালো আছি। নানির সঙ্গে থাকি। তুমি তো জানো নানি ভীষণ যত্ন করে। যেখানে থাকি দারুণ সুন্দর জায়গা। চারদিক ঝকঝকে, তকতকে। গাছে গাছে রং-বেরঙের ফুল ফুটে থাকে। ভোরবেলা পাখিগুলো কী সুন্দর গান যে গায়! গান শুনে আমার ঘুম ভাঙে। আচ্ছা মা, আমাদের ঢাকা শহরটা এমন সুন্দর হয় না কেন?

মা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

মেয়েটি আবার বলে, তোমরা আর কত দিন এই শহরের এইসব জঞ্জালের মধ্যে থাকবে?

মা মৃদু স্বরে বলে, যতদিন বেঁচে থাকতে হবে ততদিন।

মায়ের নাকে কামিনী ফুলের গন্ধ এসে লাগে। বাতাসের এক ঝাপটায় এক ঝলক গন্ধ। মা চারদিকে তাকায়। শত শত কবর। সব কবরের গায়ে গজিয়ে উঠেছে হরেক রকম ফুলের গাছ। কত যে তার গন্ধ। মা বুক ভরে শ্বাস টানে। মায়ের মনে হয়, স্বস্তি পাওয়ার জন্য এটাই এখন উপযুক্ত জায়গা। এখানে কালো ধোঁয়া নেই, বাতাসে

সিসার গন্ধ নেই। এখানে এলে চমৎকার সময় কাটে। মাকে দেখলে ছুটে আসে শিশুরা। মা ওদের সঙ্গে কথা বলে। কেউ বলে, আগামী ঈদে আমাকে একটি জামা দেবেন কিন্তু। মা বলে, দেবো। ওরা খুশিতে উজ্জ্বল মুখে তাকায়। বলে, সবাইকে দেবেন?

—হ্যাঁ, সবাইকে।

ওরা মায়ের পিছে পিছে আসে। মা ওদের পয়সা দেয়। ওরা বলে, আমরা আপনার মেয়েকে রোজ ফুল দিয়ে যাব।

মা আনমনে বলে, ও ফুল ভীষণ ভালোবাসে। তোরা জানিস আমি বিদেশে গেলে ওর জন্য সুগন্ধি মোম কিনে আনি। ও খুব মোম ভালোবাসত।

ছেলেমেয়েরা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা মায়ের মেয়েটিকে চেনে না, তবু একজন বলে, আমি তাকে স্বপ্ন দেখেছি।

—সত্যি ? কী দেখেছিস ? কেমন দেখেছিস?

—পরি স্বপ্ন দেখেছি। কী সুন্দর পাখা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায়!

মায়ের দম বন্ধ হয়ে আসে। ওদের মাথায় হাত রাখে। ভাবে, ওরাই তাকে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে।

মায়ের চোখে পানি দেখে ওরাও চোখ মোছে। শিশুদের আন্তরিকতায় মা অভিভূত হয়।

শব্দের অর্থ

অভিভূত: মুগ্ধ।

আঁতকে ওঠা: ভয়ে চমকে ওঠা।

জঞ্জাল: আবর্জনা।

দপ্তর: অফিস।

বিস্ফোরণ: ফেটে পড়া।

ভূমিমাইন: মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয় এমন বোমা।

মহামারি: সংক্রামক ব্যাধিতে বহু মানুষের মৃত্যু।

স্যান্ডউইচ: দুই টুকরা পাউরুটির মাঝখানে সবজি ও মাংস দিয়ে বানানো খাবার বিশেষ।

৬.২.৪ গল্পের কাঠামো বুঝি

'আকাশপরি' গল্পটির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সহপাঠীদের উত্তরের সাথে মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

গল্পটির বিষয় কী?	
গল্পের কাহিনি কী নিয়ে?	
গল্পে কী কী ঘটনা ঘটেছে?	
গল্পে কোন কোন চরিত্র আছে?	
চরিত্রের মুখের সংলাপগুলো কোন ভাষারীতিতে লেখা?	

৬.২.৫ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'আকাশপরি' গল্পের মেয়েটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল বলে তোমার ধারণা?

২। গল্পের মা চরিত্রটির মনের অবস্থা তুলে ধরো।

৩। 'আমাদের ঢাকা শহরটা সুন্দর হয় না কেন?'—একই রকম প্রশ্ন তোমার এলাকা সম্পর্কে করা হলে তার জবাব কী হতে পারে সংক্ষেপে লেখো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৪। ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী আলোচনা করো।

গল্প পড়ি ৩

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড', 'কিছুক্ষণ', 'দ্বৈরথ', 'নির্মোক', 'বিন্দুবিসর্গ' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি বনফুলের 'অদৃশ্যলোক' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নিমগাছ

বনফুল

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই ...

কিংবা ভেজে বেগুন সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ... দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলেন—'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।'

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল—'বাঃ কী সুন্দর পাতাগুলি ... কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কী বাহার ... এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ্—'

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারল না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

শব্দের অর্থ

খোস: চর্মরোগ বিশেষ।

গৃহকর্ম-নিপুণা: ঘরের কাজে পটু।

ছাল: বাকল।

দশা: অবস্থা।

দাদ: চর্মরোগ বিশেষ।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ: অতিরিক্ত সুনাম করা।

শান দিয়ে বাঁধানো: ইট-পাথর দিয়ে বাঁধানো।

শিল: মশলা পেষার পাথর।

সায়র: সাগর।

হাজা: চর্মরোগ বিশেষ।

৬.২.৬ গল্পের কাঠামো বুঝি

‘নিমগাছ’ গল্পটির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সহপাঠীদের উত্তরের সাথে মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

গল্পটির বিষয় কী?	
গল্পের কাহিনি কী নিয়ে?	
গল্পে কী কী ঘটনা ঘটেছে?	
গল্পে কোন কোন চরিত্র আছে?	
চরিত্রের মুখের সংলাপগুলো কোন ভাষারীতিতে লেখা?	

৬.২.৭ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘নিমগাছ’ গল্প থেকে নিমগাছের উপকারিতা সম্পর্কে যা জানলে তা লেখো।

২। ‘ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।’—বিশ্লেষণ করো।

৩। নিঃস্বার্থ উপকার ও স্বার্থপরতা এই গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, লেখো।

৪। নিমগাছের মতো উপকারী তিনটি গাছের নাম লেখো এবং সেগুলোর গুণাগুণ লেখো।

৬.২.৮ গল্প লিখি ও যাচাই করি

'গল্প পড়ি' অংশে তিনটি গল্প পড়েছ। এগুলো পড়ার পরে গল্পের বিষয় ও কাঠামো সম্পর্কে তোমার ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ৬.২.১ পরিচ্ছেদে লেখা গল্পটি নতুন করে লেখো। তোমাদের সবার লেখা গল্পগুলো একত্রে বাঁধাই করে বইয়ের মতো বানাও। বানানো বইয়ের শিরোনাম দাও এবং তা তোমাদের স্কুলের পাঠগারে রাখো।

৩য় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

৬.৩.১ প্রবন্ধ লিখি

নিচের কোনো একটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখো—

ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ;

খ) সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য;

গ) যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদী;

ঘ) বাংলাদেশের গ্রাম;

ঙ) ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো-মন্দ দিক।

তোমার লেখা প্রবন্ধ থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখো—

- বিষয়টি ব্যক্তিজীবন বা পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না?
- প্রবন্ধের কোনো ভূমিকা ও উপসংহার আছে কি না?
- একাধিক অনুচ্ছেদে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?
- রচনাটির মধ্যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়ে গেল কি না?
- প্রবন্ধটিতে ব্যবহার করা তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য কি না?
- প্রবন্ধটি বিবরণমূলক না বিশ্লেষণমূলক?
- প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও স্পষ্ট কি না?
- প্রবন্ধের কোনো অংশে তোমার নিজের মতামত তুলে ধরতে পেরেছ কি না?

প্রবন্ধ কী

গদ্যভাষায় রচিত এক ধরনের সুবিন্যস্ত রচনার নাম প্রবন্ধ। প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যের বিবরণ থাকে, আবার তথ্যের বিশ্লেষণও থাকে। প্রবন্ধ চিন্তাশীল রচনা বলে এতে আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্য বেশি থাকে। গঠন অনুযায়ী প্রবন্ধ মূলত দুই ধরনের: বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক। আবার, বিষয়ের কথা বিবেচনা করলে প্রবন্ধ অনেক রকমের হয়; যেমন—সাহিত্য বিষয়ক, ইতিহাস বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, সমাজ বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক, রাজনীতি বিষয়ক, খেলাধুলা বিষয়ক ইত্যাদি। প্রবন্ধের শুরুতে বক্তব্যের সঙ্গে মিল রেখে প্রবন্ধের একটি শিরোনাম দিতে হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রবন্ধের প্রধান অংশ তিনটি—ভূমিকা, মূল আলোচনা ও উপসংহার।

ভূমিকা: ভূমিকা প্রবন্ধের প্রবেশক অংশ। এ অংশে মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে। প্রবন্ধের শিরোনামের কোনো শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হলে সেটি ভূমিকাতেই দিতে হয়। আলোচনা কীভাবে অগ্রসর হবে, তার ইঙ্গিতও থাকে ভূমিকায়।

মূল আলোচনা: মূল আলোচনা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত থাকতে পারে। কখনো কখনো ভাগগুলোকে পরিচ্ছেদ দিয়ে বিভাজন করা যায়। এসব ক্ষেত্রে পরিচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনাম থাকতে পারে, যার নাম পরিচ্ছেদ শিরোনাম। গুরুত্বের ভিত্তিতে, যুক্তির ভিত্তিতে, কালের ক্রম অনুযায়ী পরিচ্ছেদগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিতে হয়।

এক অনুচ্ছেদ থেকে অন্য অনুচ্ছেদে উত্তরণের সময়ে সঙ্গতি থাকছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। প্রবন্ধের মধ্যে একই কথা বার বার উল্লেখ করা ঠিক নয়। এক অংশের বক্তব্য অন্য অংশের বক্তব্যের সঙ্গে কোনো রকম বিরোধ সৃষ্টি করছে কি না, সেটি খেয়াল রাখতে হয়।

মূল অংশের মধ্যে অনেক সময়ে সারণি বা নকশা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এগুলো কখনো বক্তব্যকে শক্তিশালী করে, আবার কখনো বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে। সেটি বিবেচনায় রেখে সারণি বা নকশা ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার: প্রবন্ধের শেষ অংশকে উপসংহার বলে। এটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নয়; ফলে পুরো প্রবন্ধের বক্তব্যকে এখানে নতুন করে বলার দরকার নেই। এমনকি, উপসংহারে নতুন প্রসঙ্গের অবতারণাও করা যায় না। উপসংহারে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের মতামত তুলে ধরা জরুরি। এই মতামতের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের উপযোগিতা নিয়ে কথা বলা যায়, কোনো সুপারিশ করা যায়, সিদ্ধান্ত বা ফলাফল উপস্থাপন করা যায়, সীমাবদ্ধতার কথা বলা যায়, সম্ভাবনার ইঙ্গিত তুলে ধরা যায়। 'উপসংহারে বলা যেতে পারে' বা 'সবশেষে বলা যায়'—এ ধরনের বাক্য উপসংহারে না থাকাই ভালো।

অনেক সময়ে প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার কিংবা মূল আলোচনার পরিচ্ছেদ-শিরোনাম আলাদা করে উল্লেখ করা হয় না। তবে প্রবন্ধের মধ্যে এগুলো ঠিকই বিদ্যমান থাকে।

প্রবন্ধ পড়ি

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) একজন প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'চৌচির', 'রাঙা প্রভাত', 'মাটির পৃথিবী', 'মানবতন্ত্র', 'একুশ মানে মাথা নত না করা', 'দুর্দিনের দিনলিপি' ইত্যাদি। নিচের প্রবন্ধটি লেখকের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সভ্যতার সংকট

আবুল ফজল

মানুষের একটা বড়ো পরিচয়, সে ভাবতে পারে। করতে পারে যে কোনো চিন্তা। যে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখিকে পশুপাখি হতে ভাবতে হয় না—পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই—যেটুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশি চিন্তাশীল, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অনগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে

আছে, সভ্যতারও পেছনের সারিতেই তাদের স্থান। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ—সবের বেলায় এ সত্যের তারতম্য নেই। মোটকথা, সভ্যতার প্রথম সোপানই হলো চিন্তা—চিন্তার অভ্যাস তথা বুদ্ধির চর্চা।

শুধু রসের দিক বা সৌন্দর্য সাধনার দিক যেমন সাহিত্যের সব কিছু নয়, তেমনি সভ্যতার বেলায়ও শুধু আনন্দ ও আরাম-আয়েসের উপকরণ-বাহুল্য কখনো সভ্যতার সব কিছু নয়। এমনকি সভ্যতার বড়ো অংশ নয় এসব। সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক রয়েছে মানুষের হৃদয়, মন ও চরিত্রের আর মানসিক উৎকর্ষের। মাত্রাধিক আরাম ও উপকরণ-বাহুল্য এসবকে দৃঢ় ও পুষ্ট করে তোলার পরিবর্তে বরং করে তোলে আরো শিথিল ও দুর্বল। আজ সভ্যতা মানে উপকরণ-প্রাচুর্য ও গতি। দ্রুতগামী বায়ুযানে কে কত হাজার মাইল ঘুরে এলো, কার আগে কে পৃথিবী চক্কর দিতে পারল—এ হলো এখন সভ্যতার মাপকাঠি। মানুষ ভাববে কখন, চিন্তা করবে কখন—জীবনের গভীরত্ব উপলব্ধির অবসর কোথায় আজ মানুষের?

প্রাচীন জীবন-দর্শন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন, অথচ নতুন কোনো জীবন-দর্শনও গড়ে ওঠেনি। সব জীবন-দর্শনের গোড়া হলো চিন্তা—চিন্তার চর্চা। মানুষের জীবন থেকে আজ চিন্তার ক্ষেত্র অপসারিত—ফলে কোনো জীবন-দর্শনই আজ মানুষের সামনে নেই। সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও যেখানে মানুষের অবসর সময়টুকুর অধিকাংশ গ্রাস করে চলেছে, সেখানে চিন্তা চর্চার সময় কোথায়? ফলে আজ ধীরে ধীরে, নিজের অজ্ঞাতেই মানুষ যন্ত্রের শামিল হয়ে পড়েছে। মানুষের এখন যা নিয়ে অধিকাংশ সময় কাটে তা হচ্ছে যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা। হৃদয়, মন, আবেগ, অনুভূতি সবই যন্ত্রের সুরে বাঁধা। আমি এমন পরিবারও দেখেছি যাঁরা এক ঘুমের সময় ছাড়া সব সময়ে নিজেদের রেডিও যন্ত্রটা খুলে রাখেন। নিস্তব্ধতার যে একটি অনির্বচনীয় শান্তি আছে এঁরা তার স্বাদ থেকে তো বঞ্চিত থাকেনই তদুপরি নিজেদের সুকুমার বৃত্তির ওপর কী যে নিষ্করুণ উৎপীড়ন এঁরা করছেন তাও বুঝতে পারেন না। অতি-যান্ত্রিকতার এ হচ্ছে পরিণাম। এসব মানুষের জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবার বা অন্ন-চিন্তার অতিরিক্ত অন্য চিন্তা করার অবসর কোথায়? ফলে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে এঁদের কোনো সন্দেহ থাকার কথাই নয়। রেডিও বাজানোকেই এঁরা মনে করেন চরম সংস্কৃতিচর্চা। চিন্তার প্রতি এই বিরাগ ও বিতৃষ্ণা মানব সমাজে এক মারাত্মক ব্যাধির রূপ নিয়েছে আজ। আজ সভ্যতার যে সংকট তা হচ্ছে এই চিন্তাহীনতার সংকট; আণবিক বোমা বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য মারণাস্ত্র নয়। তথাকথিত 'শীতলযুদ্ধ'ও এই চিন্তাহীনতার ফল। জীবনের মূল্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতে ভুলে গিয়েছে আজ মানুষ। ফলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সবাই প্রায় হয়ে পড়েছে নীতিভ্রষ্ট। বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা মানুষকে যুক্তিবাদী ও বিবেকী করে তোলে। যে কোনো অবস্থায় বিবেকী মানুষ হিরোশিমা ও নাগাসাকি ঘটাতে পারে না। বিবেকহীন সভ্যতা মানুষকে বর্বরতার কোন চরম সীমায় নিয়ে গেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই দুটি নাম তার অক্ষর স্বাক্ষর। নীতি ও জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া যান্ত্রিক সভ্যতা ও তার প্রগতি মানুষকে কোনো লক্ষ্যেই নিয়ে যায় না।

নীতি ও জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাসের চরম পরিচয় মেলে যুদ্ধ ও তথাকথিত জাতীয় সংকটের সময়ে। তখন নীতি, ন্যায়, সত্য ও মূল্যবোধ সবই হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার চরম কাম্য যে কোনো মূল্যে জয় অর্জন। হিরোশিমা ও নাগাসাকি এই আদর্শেরই দুই বলি। চিন্তা করার বা চিন্তা করতে না দেওয়ার ফলে তাবৎ সভ্য দেশের অধিকাংশ লোক 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বলে একে মেনে নিয়েছেন।

নিজে চিন্তা না করার সবচেয়ে বড়ো কুফল হচ্ছে সত্য-মিথ্যা যে কোনো কথা ও প্রচারণাকে বিশ্বাস করে বসা। আর যান্ত্রিক সুখ-সুবিধায় অভ্যস্ত মানুষও মাথা খাটানোর কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাই আজ সর্বত্র চিন্তার

ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বন্ধ্যত্ব, মানুষ হয়ে পড়েছে গতানুগতিক, হারিয়ে বসেছে সত্যের প্রতি সব রকম অনুরাগ। মানুষের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের-যে কোনো মূল্য আছে মানুষের মন থেকে সে বোধও আজ নিশ্চিহ্ন। যন্ত্র-জগতের যেমন দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদল হচ্ছে—মানুষের মত, বিশ্বাস আর ধারণাও তেমনি দিনে দিনে ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টাচ্ছে। কোনো মত বিশ্বাসই আজ মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারছে না। আজ সভ্যতার এই এক শোচনীয় দশা। এ অবস্থায় কোনো বড়ো ও উচ্চ জীবনদর্শন আশা করাই যায় না। আশা করা যায় না কোনো মহৎ শিল্প-সাহিত্যও। রম্য রচনার সংখ্যা বৃদ্ধির এও এক বড়ো কারণ। বিগত সভ্যতা, যা মহৎ শিল্প-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, এমনকি রেনেসাঁস ও এনসাইক্লোপিডিস্টদের যুগের দিকে তাকালেও আমরা বুঝতে পারব, মত-বিশ্বাস-আদর্শ-নিষ্ঠা, যা চিন্তা চর্চার ফল—সভ্যতার স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কতখানি আবশ্যক। আধুনিক সভ্যতার পায়ের তলায় এই অত্যাবশ্যক শর্তগুলি অনুপস্থিত। ফলে আজ সভ্যতার ত্রিশঙ্কু দশা।

বর্তমান সভ্যতা কোনো গভীর ভাব ও চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে ক্রমবর্ধমান এত উন্নতি সত্ত্বেও পদে পদে ট্রাজিক পরিণতির হাত থেকে তা রেহাই পাচ্ছে না। আজ এই মহাসংকটের দিনে বাঁচতে হলে মানব সভ্যতাকে একটা নীতি ও সত্যের ওপর দাঁড় করাতে হবে। আর তা করাতে হলে মানুষকে ভাবতে হবে, করতে হবে চিন্তা ও যুক্তির চর্চা, হতে হবে বিবেকী।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অক্ষর স্বাক্ষর: লিখিত সাক্ষ্য।

অনির্বচনীয়: বর্ণনাতীত।

উৎকর্ষ: উন্নতি।

এনসাইক্লোপিডিস্ট: আঠারো শতকের ফরাসি পণ্ডিত, যাঁরা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছিলেন।

জীবন-দর্শন: জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি।

ট্রাজিক: বিষাদময়।

তাবৎ: সম্পূর্ণ।

ত্রিশঙ্কু দশা: জটিল অবস্থা।

নাগাসাকি: জাপানের একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই শহরে আমেরিকা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

নিষ্করুণ: করুণ অবস্থা

নীতিভ্রষ্ট: আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

বালাই: আপদ।

বিবেকী: বিবেকবান।

মারণাস্ত্র: হত্যা বা ধ্বংস করতে পারে এমন অস্ত্র।

যুক্তিবাদী: যুক্তিকে যারা প্রাধান্য দেয়।

রম্যরচনা: হাস্যরসাত্মক রচনা।

রেনেসাঁস: নবজাগরণ।

শীতলযুদ্ধ: মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।

সোপান: সিঁড়ি।

স্থিতি: স্থিরতা।

হিরোশিমা: জাপানের একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই শহরে আমেরিকা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

৬.৩.২ প্রবন্ধের গঠন বুঝি

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি পড়া হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডান কলামে লেখো। সহপাঠীদের সাথে তোমার উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

প্রবন্ধটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা?	
ভূমিকায় লেখক কী বলেছেন?	
মূল আলোচনায় কোন কোন বিষয়ের অবতারণা করেছেন?	
উপসংহারে লেখক কী বলেছেন?	
গঠনের দিক থেকে প্রবন্ধটি কোন ধরনের?	
বিষয়ের দিক থেকে প্রবন্ধটি কোন ধরনের?	

৬.৩.৩ জীবনের সঙ্গে প্রবন্ধের সম্পর্ক খুঁজি

১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে তোমার উত্তর সংশোধন করো।

১। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লেখক কী বলতে চেয়েছেন?

২। ‘সভ্যতার প্রথম সোপানই হলো চিন্তা—চিন্তার অভ্যাস তথা বুদ্ধির চর্চা।’—আলোচনা করো।

৩। ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ‘মানুষ আজ অতিযান্ত্রিক।’ তোমার জীবনের ও আশেপাশের মানুষের মধ্যে এই অতিযান্ত্রিকতার রূপটি কীভাবে দেখতে পাও?

৬.৩.৪ প্রবন্ধ লিখি ও যাচাই করি

৬.৩.১-এ যে প্রবন্ধ লিখেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। এই পরিমার্জনের সময়ে প্রবন্ধের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব ধারণা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভালো করে খেয়াল করো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৪র্থ পরিচ্ছেদ

নাটক

৬.৪.১ নাটক লিখি

কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে তার উপরে নাটক রচনা করো।

তোমার লেখা নাটকের ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও–

- নাটকটির কাহিনি কী নিয়ে?
- কাহিনি তুলে ধরার জন্য কোন কোন ঘটনা এসেছে?
- ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা দৃশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?
- নাটকে কোন কোন ধরনের চরিত্র আছে?
- চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ দেওয়া হয়েছে কি না?
- নাটকের নামকরণ যথাযথ হয়েছে কি না?

নাটক কী

সংলাপের মাধ্যমে রচিত সাহিত্যের শাখাকে নাটক বলে। নাটক মূলত অভিনয়ের জন্য রচনা করা হয়। নাটকের মূল উপাদান ৪টি: কাহিনি, দৃশ্য, চরিত্র ও সংলাপ।

কাহিনি: নাটকে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে কাহিনি সাজানো হয় এবং সেই কাহিনি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এই কাহিনি বাস্তবতানির্ভর কিংবা কল্পনামূলক হতে পারে। নাটকের কাহিনি সরলরেখায় চলে না, এখানে ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব থাকে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব মূলত জীবন থেকে নেওয়া।

দৃশ্য: নাটকের ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা দৃশ্যে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি দৃশ্য কোথায় ঘটছে, তা দৃশ্যের শুরুতে উল্লেখ করা থাকে। কয়েকটি দৃশ্য মিলে তৈরি হয় অঙ্ক। একটি নাটকে এক বা একাধিক অঙ্ক থাকে। প্রাচীন নাটকে পাঁচটি অঙ্ক দেখা যেত। এই পাঁচ অঙ্কে কাহিনি এভাবে সাজানো হতো: কাহিনির আরম্ভ, কাহিনির বিস্তার, কাহিনির চূড়ান্ত অবস্থা, কাহিনির পরিণতি এবং কাহিনির পরিসমাপ্তি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চরিত্র: ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে চরিত্রের প্রয়োজন হয়। নাটকে ভালো-মন্দ সব ধরনের চরিত্র থাকে। প্রতিটি চরিত্র ব্যক্তিত্ব ও আচরণের দিক দিয়ে আলাদা হয়। নাট্যকার চরিত্রগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তৈরি করেন।

সংলাপ: সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমে ঘটনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং কাহিনি এগিয়ে যায়। তাই সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে যত্নশীল হতে হয়।

নাটক যেহেতু অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তাই নাটকের সঙ্গে অভিনয়, মঞ্চ ও দর্শক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাটকের চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যারা নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করেন এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন, তাদের বলে অভিনেতা। নাটকের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে অভিনেতারা পোশাক পরেন এবং রূপসজ্জা করেন। মঞ্চে ও স্টুডিওতে নাটকের দৃশ্য অনুযায়ী কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা হয়। মঞ্চ ও স্টুডিওতে আলোক প্রক্ষেপণ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। দর্শকের কাছে নাটকটি অধিক আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাটকের মহড়া বা অনুশীলনের দরকার হয়।

বিষয় অনুযায়ী নাটক অনেক রকমের হতে পারে; যেমন– সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক ইত্যাদি। আবার নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন ইত্যাদি ভাগেও ভাগ করা হয়ে থাকে।

নাটক পড়ি

মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ‘কী চাহ শঙ্খচিল’, ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’, ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’, ‘রাজা অনুস্বারের পালা’ ইত্যাদি।

তোমাদের জন্য মমতাজউদদীন আহমদের লেখা ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকটি দেওয়া হলো। নাটকটি ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ রচিত হয়।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

মমতাজউদদীন আহমদ

চরিত্র

বর্গিওয়ালা	:	বয়স ৫৫
হুকমত খাঁ	:	বয়স ৩৫
দুখু মিঞা	:	বয়স ৩৫
বৃদ্ধ	:	বয়স ৬০
ফারুক	:	বয়স ২৬
গায়ক	:	বয়স ৩০
জহুরুল	:	বয়স ২৮
ঝকড়ু	:	বয়স ৩৫

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রথম দৃশ্য

[সময় সন্ধ্যা, রাজপথের মোড়। অকস্মাৎ সান্ধ্যআইন ঘোষিত হয়েছে। থমথমে পরিবেশ।]

বর্গি : এসব কে লাগিয়েছে, হুকমত খাঁ?

হুকুমত : দেখলে তো দুশমনের বুকের লহু শুষে লিতাম। এই দুখু মিঞা তুমি দেখেছ?

দুখু : আমি দেখিনি।

বর্গি : দেখোনি তো খুব মরদের কাজ করেছ! কারফিউর মধ্যে দুশমন এসে মনের সুখে দেয়ালে পোস্টার সেঁটে গেল, আর তুমি দেখোনি? যেখানেই নজর পড়ছে, একই লেখা-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতা মাঙছে। কেন? আমরা কি স্বাধীন না? কী দুখু মিঞা, স্বাধীনতা কেন?

দুখু : আমি জানি না বর্গিওয়ালাজি।

বর্গি : তা জানবে কেন? সব তো আমাদের জানতে হবে। এ মুল্লুকে বন্যার পানি রোখা গেল না কেন, দায়ী এই বর্গিওয়ালা। সাইক্লোন তুফানে দশ লাখ মানুষ মরে গেল, দায়ী কে? এই বর্গিওয়ালা। তোমার সাড়ে সাত কোটি আদমের আওলাদ খেতে পায় না, আমি দায়ী? বাট হোয়াই? আমি কেন রে দাদা? আমার কলকারখানা আছে, ব্যাংক ইন্সুরেন্স করেছি, সে কি তুমি টাকা দিয়েছ? আমার মাথার মগজ খাটিয়ে, আল্লাহর মেহেরবানিতে টাকা করেছি, পুঁজি বানিয়েছি-করেছি তো তোমার বাপের কী? উঃ! তামাশা দেখো। বেশ আমি পুঁজিপতি। কিন্তু তাতেই সব দোষ আমার হয়ে গেল। আমি কি তোদের মতো দিনে রাতে দু সের চালের ভাত খাই? খাই তো আধ পোয়া আটার রুটি আর স্রেফ দুটো আন্ডা, রাতে আধা সের গোরুর দুধ। আর তোরা স্বাধীনতাওয়ালারা বস্তা বস্তা ভাত, মাছ, নুন, তেল, মরিচ খেয়ে দেশটাকে ছোবড়া ছোবড়া করে দিলি, সেদিকে তো নজর নাই। বলে কি না, আমরা সম্পদ চুষে খাচ্ছি। হুকুমত খাঁ, দুশমনদের শায়েস্তা করতে হবে।

হুকমত : দুশমনের সিনা ছিঁড়ে লিব বর্গিওয়ালাজি।

বর্গি : আলবত, আপনা জান কোরবান করে ওয়াতানের সামাল করো। এসব খুব বুড়ি বাত। এরা কীসের স্বাধীনতা চায় আঁ? আমরা তো ভাই ভাই। যত সব বেইমান, ধর্ম নাই, ইমান নাই, আজাদি লিবে। আমরা কি ইংরেজ? আমরা তো তোদের জানের ভাই বেরাদর।

হুকমত : জাহাজে জাহাজে সিপাহি লিয়ে আসেন। এ মুল্লুকের ঘরে ঘরে দেশের দুশমন কা বাচ্চা তড়পাচ্ছে।

বর্গি : আর কত দিন তড়পাবে! এসব ফুসর ফাসুর আলাপ আলোচনার মধ্যে আমার বিশ্বাস নাই। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ো। টেনে আনো, চাবুক চালাও, সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। দেশটা মগের মুল্লুক হয়ে গেল না কি!

হুকমত : বর্গিজি ঐসব লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিই?

বর্গি : জরুর। এই দুখু মিঞা, যাও তামাম পোস্টার ছিঁড়ে নিয়ে এসো।

দুখু : আমি?

বর্গি : হ্যাঁ তুমি। তোমার ভালোবাসার ভাইরা তো টাঙিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে পাপ ক্ষয় করো। লেখার নকশা দেখো! অ আ ক খ। উর্দু জবান শিখব না। শিখো না। যখন দোজখের আগুনে জ্বলবি তখন বুঝবি। দুখু মিঞা, বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে থেক না, পোস্টার ছিঁড়ে লিয়ে এসো। যাবে না? হুকমত খাঁ।

হুকমত : দুখু মিঞা, এক দো তিন বলব। যদি না যাও, এক, দো-

[দুখু যাচ্ছে। দুজনের হাসি।]

বর্গি : সাবাস! কুত্তার লেজ রাইফেলের ধাক্কায় সোজা হয়ে গেল। এইতো এনেছ ছিঁড়ে, ধন্যবাদ। যাও দেয়ালের ঐদিকে আরো পোস্টার লেগে আছে, সবকিছু ছিঁড়ে এনে জ্বালিয়ে দাও। দেশের কাজ করো।

হুকমত : দুখুকে একদিন এমন বসিয়ে দেবো বর্গিজি।

বর্গি : বেশি বাঁকা পথ ধরলে আলবত বসিয়ে দেবে। বেহুদারা সুযোগ পেলেই কামড়াতে চায়। কোনো রহম কোরো না। হুকমত, যেমন করে পারো ওদের কোমর ভেঙে দাও।

হুকমত : হুকুম করেন তো আজ রাতের মধ্যেই-

বর্গি : উহু, থোড়া আস্তে। ওদিকে ফুসুর ফাসুর তামাশা চলুক, আর এদিকে আমরা জাহাজ খালাস করি, আমাদের মালামাল সব পশ্চিমে চালান করে দিই। তারপর একদিন ঠিক সময়মতো সিগন্যাল এসে যাবে-তখন-

হুকমত : দেরি হবে না তো?

বর্গি : দেরি? সেনাবাহিনী আর আমরা একজোট হলে আল্লাহর গজবকেও তোয়াক্কা করি না হুকমত খাঁ।

হুকমত : আল্লাহর গজব?

বর্গি : কেন করব! সব কিছু ঠিকঠাক করে নিলে তখন ফের আল্লাহর মেহেরবানির জন্য কান্নাকাটি করব, দু আনা চার আনা খয়রাত করব। এরা বলবে, বাহ! কেমন দিলওয়ালা লোক। আমাদের তারিফ করার জন্য কেতাবে লিখতে বলব, বর্গিজি প্রাইজ দিব দশ হাজার টাকা। মাশাল্লাহ তখন দেখো কেমন সুরসুর করে ছুটে আসবে। কিন্তু খুব সাবধান, এবার যদি আমি তুমি হেরে যাই, তাহলে আমিও শেষ তুমিও খতম।

হুকমত : আমরাও খতম?

বর্গি : না খেয়ে মরে যাবে। তোমাকে দিলের কথা বলে দিই। তোমার আমার বাঁচাতো এ মুল্লুকের জোরে। এদের মাটির মতন এমন সোনার মাটি কোথায় পাবে? পাট আর ধান।

হুকমত : মাগার, আপনারা যে বলেন, বিদেশ থেকে চাল না দিলে এরা না খেয়ে মরে যাবে।

বর্গি : চুপ। সে সব বহুত কিসসা। বন্যা সমস্যা মিটে গেলে এদেশে ধানের বন্যা বয়ে যাবে।

হুকমত : তো বন্যা মিটিয়ে ফেলেন।

বর্গি : উঁ! মিটিয়ে ফেলব? তাহলে তোমার আমার মরুভূমি আর নুনের মাটি আবাদ হবে কেমন করে! পাহাড় রাজধানী বানাব কী করে? তোমার সেনাবাহিনীর জন্য টাকা দেবে কে?

হুকমত : কেড়ে লিব দুশমনদের কাছ থেকে।

বর্গি : সাবাস, তাহলে এদেরকে দিনরাত দুশমনই বলতে থাকো। চুপ, দুখু আসছে।

[দুখু এলো।]

এসো ভাই দুখু মিঞা, সব পুড়িয়ে দিয়েছ?

দুখু : হাঁ।

হুকমত : কাজের কাজ করেছ। কে বলে তোমরা হুকুম মানো না! ইমান ঠিক রেখে কাজ করে যাও, আল্লাহ রহমত ঢেলে দেবে। দুখু মিঞা আর হুকমত খাঁ ভাই ভাই। কোনো ফারাক নাই, কোনো অবিচার নাই। দুশমনকে খতম করো।

দুখু : এই লাঠি দিয়ে? আমাদের অস্ত্র তো কেড়ে নিয়েছে।

বর্গি : এই শোনো আহাম্মকের কথা। অস্ত্র কাড়বে কেন, তোমরাই খুশি দিলে জমা দিয়ে দিয়েছ। দেশের মধ্যে তোমাদের ভালোবাসার ভাই বেরাদর হট্টগোল করছে, তুমি শান্তি আনছ। যদি রাগের মাথায় আপন ভাইয়ের সিনাতে গুলি করে দাও, তাহলে? না ভাই না, মন খারাপ কোরো না।

হুকমত : দুখু ভাই, যদি দুশমন তোমাকে মারতে আসে, আমি তোমার জন্য জান কোরবান করে দেবো।

বর্গি : দেখলে কত বড়ো দিলওয়ালা হুকমত খাঁ! আর তুমি কিনা হিংসা করছ। আল্লাহকে কী জবাব দেবে? এজন্যই তো তোমরা জেনারেল হতে পারলে না! আল্লাহকে ডাকো, বলো আমার দিল খুব ছোটো, খামোখা আমি হিংসা করি, মাফ করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা!
[বর্গির প্রস্থান]

হুকমত : দুখু মিঞা, তোমাদের খুব সুখ, কোনো ভাবনা নাই।

দুখু : কেন?

হুকমত : তোমাদের মুল্লুকে কিছু নাই, খালি পানি আর পানি। পশ্চিম মুল্লুকের থেকে কাপড় আসছে, গম আসছে, গভর্নর আসছে। তোমরা মজা করে খাচ্ছ আর মিটিং করছ।

দুখ : তোমরা পাঠাচ্ছ কেন, সব বন্ধ করে দাও।

হুকমত : তাহলে তো নিমকহারামের মতো কাঁদতে লাগবে।

বর্গি : কেতাবে লেখা আছে, ফিল্ড মার্শাল সাহাব লিখেছেন, তোমরা বেইমান, গাদ্দার। ফিল্ড মার্শাল কি ঝুট কথা বলবে?

দুখু : তোমাদের লোকটা আমাদের ইতিহাস জানে না, মিথ্যাবাদী, বানোয়াট।

হুকমত : জবান বন্ধ কর! তোর লাঠি ভি কেড়ে লেবো। গোস্ত কেটে নুন ছিটিয়ে দেবো, বাপের নাম ভুলে যাবি। কোন? ... কোন হারামি ওখানে?

[ঝকড়ুর প্রবেশ।]

ঝকড়ু : হামি ঝকড়ু সিপাহিজি।

হুকমত : ঝকড়ু। সব কাম খতম করেছিস? কথা বল।

ঝকড়ু : না, মালিক।

হুকমত : না? কটা লাশ ট্রাকে উঠল?

ঝকড়ু : গুনতে গুনতে ভুলে গেলাম। একশোটা হবে। আরো একশোটা পড়ে আছে।

হুকমত : তো দুশোটা। বারো ঘণ্টাতে মাত্র দুশোটা দুশমনকে গুলি? হামার মুল্লুকের নওজোয়ানরা করছে কী! এত কম করে মারলে সাত কোটি দুশমন মারতে সাতশো সাল লেগে যাবে। পাখির বাচ্চার মতো ঠুস ঠুস করে মারবি তবে তো! আজাদি লিবে? যা ঝকড়ু বাকি লাশ ট্রাকে তুলে লাইনে চলে যা।

ঝকড়ু : আমি পারব নাই সিপাহিজি।

হুকমত : পারব নাই? ঝকড়ু-

ঝকড়ু : আমার দিল ফেটে গেল, এই দেখেন, মানুষের রক্তে হামার হাত দুখান লালে লাল হয়ে গেল, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

হুকুমত : মাথা খারাপ হলে দারু পিয়ে লে।

ঝকড়ু : একটা লাশ, দশটা লাশ এমনি করে নব্বইটা লাশ উঠিয়েছি। এক বাড়িতে ঢুকে দেখি, তিনটা লাশ রক্তের মধ্যে ভাসছে। বেটাকে তুললাম, একটা জোয়ান বেটাকে তুললাম, ফের ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম কি মায়ের সিনা ফাটিয়ে গুলি চলে গেছে। মা জননী শুয়ে আছে, আর বাচ্চাটা মায়ের বুকে লহুর মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চাটা তখনও ছটফট করছে। আমি পারলাম না, পালিয়ে এলাম। এমন লহু, এমন ছেলে, এমন মাকে গায়েব করতে পারলাম না। মালিক হামি পারব নাই। মায়ের লহুতে লালে লাল এ হাত দুটা অবশ হয়ে গেল।

হুকমত : ঝকড়ু, তুই ফের যা।

ঝকড়ু : না মালিক যেতে বলিস না, তোর পায়ে ধরছি, আর না।

হুকমত : এই টাকা লিয়ে যা।

ঝকড়ু : আমার টাকার নেশা, লোভের নেশা, লাশ টানার নেশা সব কেটে গেল। এখন আমার চোখের মধ্যে, এ পাত্থর সিনার মধ্যে হামার মা জননীকে দেখছি, মায়ের ছেলেকে দেখছি। তোরা এসব কাজ করিস না মালিক। আমি মানুষের লহু, পাবলিকের লহু সাফ করতে পারব না। না, পারব না।

হুকমত : ঝকড়ু, তুই যাবি না?

ঝকড়ু : তোর ঐ গুলি দিয়ে আমার বুক ফাটিয়ে দে, শেষ করে দে, হামাকে বাঁচিয়ে দে।

হুকমত : এদের সঙ্গে নাম দিয়েছিস? যা, লাশ লিয়ে ট্রাকে বসে থাক। হারামি।

[ঝকড়ুর প্রস্থান।]

দুখু মিঞা, ঝকড়ুর মেজাজ কে বিগড়াল? বলো।

দুখু : জানি না।

হুকমত : চুপ করো বেইমান। তুমি সব জানো। আর হামরাও জানি তোমাদের গাদ্দারি কেমন করে খতম করতে হয়। দুখু মিয়া, আজতক তোমার মুল্লুকের কজন ভাইকে গুলি করে খতম করেছ?

দুখু : করিনি।

হুকমত : করোনি মাগার এখন থেকে করবে। তোমার ঐ লাঠি দিয়ে ঝকড়ুকে পিটিয়ে শেষ করতে হবে। কী, পারবে না? কী দেখছ আমার চোখে? হুকুম তামিল করো, যাও।

দুখু : তোমার রাইফেলটা দাও।

হুকমত : রাইফেল? অস্ত্র দেবো নিমকহারামের হাতে! তোমার মুল্লুক থেকে সব লিয়ে চলে যাব। দা, চাক্কু সব চলে যাবে পশ্চিমে। তারপর ঘরে ঢুকে তোমাদের জানমাল সব কেড়ে লিবো। লাশ টেনে রাস্তায় ফেলে দেবো, গিদ্ধর কুত্তাতে খাবে তোমাদের মা বহিনকে।

দুখু : আর আমরা কী করব।

হুকমত : কী করবে? আমাদের পা ধরে মাপ চাইবে, ভিখ মাঙবে। ... এই, কোন হো তুম?

[বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : আমি নিরীহ মানুষ বাবা। বুড়ো মানুষ, ছুটতে ছুটতে আসছি। কোনো গাড়ি ঘোড়া পেলাম না। আমার খুব বিপদ, ঐ যে দেখো, আমাদের বাড়ি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দুখু : এ কী করছেন আপনি? কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃদ্ধ : যখন বের হই, তখন ছিল না, হঠাৎ করে কারফিউ দিয়েছে। দেরি হয়ে গেল বাবা, ঘরে আমার স্ত্রী ওষুধের জন্য ছটফট করছে। সময়মতো ওষুধ পড়লে হয়তো বেঁচে যাবে, তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।

দুখু : ওর ঘরে খুব বেমার আছে হুকমত খাঁ, দাওয়াই নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। যান যান, আর কখনো কারফিউর মধ্যে রাস্তায় আসবেন না।

বৃদ্ধ : আল্লাহ তোমাদের ভালো করবে বাবা।

হুকমত : এই কোথায় যাবি?

বৃদ্ধ : বিশ্বাস না হয় এই দেখো ওষুধ, ফলমূল। আমার ফারুকের মা ওষুধ না হলে বাঁচবে না। ওর কষ্ট দেখে থাকতে পারিনি, আর কখনো এ কাজ করব না। আমাকে যেতে দাও সিপাহিজি।

হুকমত : সাবাস, সাবাস বুড্ডা। খুব উমদা কিসসা বানিয়েছ। বিবির খুব বিমার, বিবি মরে যাবে? তোমার বিবি কবে মরবে? বিবি মরলে তোমার দিলের মধ্যে খুব ধড়ক করবে বুড্ডা?

দুখু : আহ্ তুমি এসব কী বলছ হুকমত খাঁ!

হুকমত : চোপরাও দুখু মিয়া। বল তোর বিবি জোয়ান না বুড্ডা।

বৃদ্ধ : আমার পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বড়ো ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।

হুকমত : পরফেসার। ঐ পরফেসাররাই যে এ মুল্লুকের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছে। এই বুড্ডা পরফেসারের বাপ। তোর বুড্ডি বিবি মারা গেলে আর একটি শাদি করবি। ... এই প্যাকেটের মধ্যে কি রে বুড্ডা? বোমা?

বৃদ্ধ : না, না, দুটো আপেল, ডাক্তার বলে দিয়েছে।

হুকমত : আপেল? বাহ রে, বুড়ার দিলে মহব্বত ভি আছে। এই আপেল হামার মুল্লুকের ফল। হামি খাবো, তোর বুড্ডি খাবে না। [আপেল খেতে লাগল।]

বুড্ডা তুই কিছু খাবি না? বাপ রে বাপ, তোরা হামাদের জানের দোস্ত। তোকে ভি কিছু খেতে হবে ভাই। কী খাবি তুই, তোর বিবির দাওয়াই খা। ঢক ঢক করে খেয়ে লে। তুই খেলে তোর বিবির বিমার ভালো হয়ে যাবে। খা বুড্ডা।

[রাইফেল দিয়ে ওষুধে গুঁতো দিলো। শিশি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। হুকমত অমানুষিকভাবে হেসে উঠল।]

বৃদ্ধ : আমাকে তুমি মেরে ফেলো। তোমার গুলি দিয়ে আমার বুকটা ফাটিয়ে দাও। আল্লাহ, তুমি এখনো এত সহ্য করছ?

হুকমত : এই আল্লাওয়ালা, কাঁদলে তোর জবান ছিঁড়ে লিবো। হামি যা বলব সেই রকম বল। বল আমরা পাপী, বল।

বৃদ্ধ : বলব না।

হুকমত : বলবি না, আসল কথা বলতে শরম লাগছে। স্বাধীনতা চাও। আজাদি লিবে? হামরা তোদের মালিক, তোদের ধনদৌলত তামাম কিছুর মালিক। তোরা হামাদের কলোনির প্রজা। আমরা তোদের প্রেসিডেন্ট, হামরা ফিল্ড মার্শাল।

বৃদ্ধ : তোরা চোর লুটেরা ডাকাত, তোরা জানোয়ার।

হুকমত : চুপ কর! [বৃদ্ধের গালে চড় মারল।]

বৃদ্ধ : না, চুপ করব না। আর কত কাল চুপ করে থাকব। ধর্ম আর একতার নামে তেইশ বছর চুপ করে ছিলাম, আর নয়। যত জুলুম করিস না কেন, আর নয়। আর চুপ করে থাকব না।

[ফারুকের প্রবেশ]

ফারুক : বাবা, বাবা কোথায় তুমি!

[হুকমত খাঁ ফারুককে গুলি করল।]

বৃদ্ধ : ফারুক, আমার ফারুক।

ফারুক : বাবা, আর দেরি কোরো না, মা ওষুধের জন্য কেমন করছে। মাকে বাঁচাও বাবা। তুমি যাও, দেরি কোরো না বাবা।

বৃদ্ধ : ফারুক, তুই আমার সঙ্গে যাবি না বাবা? ফারুক আমার, কথা বল বাবা, তোর জন্য যে আমি কলম কিনেছি বাবা, তুই যে বলেছিলি কবিতা লিখবি, বাংলাদেশের কবিতা। এই কলম নিয়ে এখন আমি কী করব?

ফারুক : বাবা, এ কলমে আমার বুকের রক্ত ভরে নাও। রক্তভরা কলমটা ছোটো ভাই মতিউরকে দিও। রক্ত দিয়ে মতিউর দেশের গান লিখবে।

[ফারুক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।]

হুকমত : এই দুখু মিয়া, ট্রাক থেকে ঝকড়ুকে ডেকে লিয়ে এসে লাশটা উঠিয়ে লিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বধ্যভূমির এক প্রান্ত। রাত গভীর।]

বর্গি : আমাদের পিয়ারা ওয়াতানকে ঝড় ঝাপটা আর আবোল আবোল হৈহুল্লোড় থেকে বাঁচবার জন্য জান খাতরা করে হুকমত খাঁ আর তার সাথিরা যা যা করছে, সব ঠিক করছে। না হলে এ পিয়ারা ওয়াতান পয়মাল হয়ে যাবে। তোমরা কী বলো! আমি সাফ দিলের মানুষ, সোজা সরলভাবে বুঝি। আর তোমরা হলে বেকুব, আহম্মক, হল্লামাচানেওয়ালা। তোমাদের মুল্লুকের ভাই বেরাদর জান দিলো, তাতে কার কী হলো? কারো কিছু হলো না। বিশ্বাস করো, তোমাদের আহাম্মকি দেখে আমি দিনরাত চোখের আঁসু ফেলেছি। এত কেঁদেছি যে আমার বিবি সাহেব ব্লাড প্রেসারের রোগী, আমার দুঃখ দেখে রক্তের চাপে বেহুঁশ হয়ে গেল। ভালো লাগে না ভাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না। এসব ভালো কথা নয়। তবে তোমরা কিচ্ছু ভেব না ভাই, তোমাদের আত্মীয়স্বজনকে আমি দাঁড়িয়ে থেকে দাফন করেছি। সুন্দর সাদা কাপড়ের কাফন দিয়ে আস্তে আস্তে তাজিমের সঙ্গে গোরের মধ্যে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শুইয়ে দিয়েছি। সেই কাফনের কাপড় নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছি, লোবান বাত্তি ভি কিনেছি। তোমরা যদি আমাকে সে টাকা ফেরত দাও আমি লিবো না, হারগিজ লিবো না। কেন লিবো?

গায়ক : তোমার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেবো।

হুকমত : এই, বেহুদা।

বর্গি : হুকমত খাঁ, রাগ কোরো না। এই ভাই, তা তুমি তো হলে ফানকার। গান করো। তোমার মুখে এত থুথু কেন ভাইয়া?

গায়ক : অসহ্য ঘৃণা, মনুষ্যত্বহীন বিবেকহীনদের আমরা ঘৃণা করি। পৃথিবীটা সুন্দর। সেখানে আমার গান আর জীবন চেয়েছি, তোমরা আমাদের হত্যা করেছ। আমরা তোমাদের ধ্বংস করব।

বর্গি : আর এখন আমি যদি বেয়োনেট দিয়ে তোমার গলাটা ফুটো করে দিই।

গায়ক : আমি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে গ্রহণ করব। আমার বাংলার স্বাধীনতার জন্য আমার মৃত্যু-আমার কী ভাগ্য!

বর্গি : তোমার ফুটা গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়বে। ওসব পাগলামি বাদ দাও, তোমাকে ছেড়ে দেবো, যদি কসম করো আর কোনো দিন বাংলা বাংলা করবে না, মাসে মাসে মোটা টাকা পাবে।

গায়ক : [গান] আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে।

বর্গি : হুকমত, লিয়ে যাও।

বৃদ্ধ : আল্লাহর দোহাই, ওকে মেরো না, তোমরা অমানুষ হোয়ো না।

গায়ক : আপনি দুঃখ করবেন না। এই তো আমরা চেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলাদেশের জন্য আমি যে জীবন দিতে পারছি, এ আমার কত আনন্দ!

[গান] মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ-

বৃদ্ধ : না, না নিয়ে যেয়ো না। আল্লাহ, কবে তোমার রহমত নেমে আসবে।

[হুকমত গায়ককে নিয়ে চলে গেল।]

বর্গি : আসবে না, কখনো আসবে না। বুড়া, কার জন্য কাঁদছ, আঁ?

[গুলির শব্দ।]

শুনতে পেলে। তোমার গায়ক খতম, শেষ হয়ে গেল। দুশমনের বংশ রাখব না। ঝকড়ু লাশ তুলে নে।

[হুকমতের প্রবেশ।]

হুকমত : বর্গিজি।

বর্গি : দুখু মিয়া, কেমন লাগছে? দিল আওর সিনা শক্ত করো, ওয়াতান আর কওমের কাজে জুলফিকারের ধার আনো। তারপর কোনটা নওজোয়ান, কী নাম তোর?

জহুরুল : জহুরুল হক।

বর্গি : জহুরুল হক। বাহ সুন্দর নাম। মরবি না বাঁচবি?

জহুরুল : আমার আঙুলের মধ্যে চারটা করে মোটা মোটা সুঁই ভরে দিয়েছে। দশ হাজার পাওয়ার লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন তিন রাত বসেছিলাম, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বুকে আর পিঠে তোমার সিপাহিরা শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে। তবু আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে থাকব, বাংলার স্বাধীনতার জন্য বেঁচে থাকব।

বর্গি : গায়কের মতো তোকে মরতে হবে।

জহুরুল : আমি আবার বেঁচে উঠব। যতবার মারবে ততবার বাঁচব।

বৃদ্ধ : সাবাস।

বর্গি : নওজোয়ান, কী চাও তুমি?

জহুরুল : স্বাধীনতা। বাংলার স্বাধীনতা। পুঁজিপতি আর শোষকের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে চাই, তোমাদের সব কিছু কেড়ে নিয়ে সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাই।

বর্গি : না। আমার টাকা আমার থাকবে, কাউকে দেবো না।

জহুরুল : তাহলে আমার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকো।

বর্গি : হুকমত খাঁ, নিয়ে যাও।

বৃদ্ধ : আমাকে নিয়ে চলো, ওকে ছেড়ে দাও।

জহুরুল : বলো বীর, বলো উন্নত মম শির, শির নেহারি-

[হুকমত জহুরুলকে নিয়ে গেল।]

বৃদ্ধ : আমি জ্ঞানত কোনো দিন মিথ্যা বলিনি, আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করিনি, কারো অমঙ্গল চাইনি। আমি বলছি আল্লাহর গজব পড়বে, তোরা ধ্বংস হবি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি।

[গুলির শব্দ]

আহ। আল্লাহ তুমি দেখো, দেখো সব। রোজ কিয়ামতের দিনে হিসাব মিলিয়ে নিয়ো, এদের ক্ষমা কোরো না।

বর্গি : ক্ষমা! তোর মুখে আল্লাহর নাম।

[হুকমতের প্রবেশ।]

হুকমত : কানের মধ্যে নল ঢুকিয়ে গুলি করেছি, মগজ আসমানে উড়ে গেল।

বর্গি : বহুত খুব। এবার বুড্ডাকে নিয়ে যাও।

হুকমত : এই বুড্ডা।

বৃদ্ধ : চল।

দুখু : হুকমত খাঁ।

হুকমত : খামোশ!

দুখু : ছেড়ে দাও।

বৃদ্ধ : দুঃখ কোরো না বাবা। আমার ছেলেরা মরছে, আমি বাঁচব কোন সুখে?

[হুকমত বৃদ্ধকে নিয়ে গেল।]

দুখু : বর্গিজি, ছেড়ে দিতে বলেন। ওর কোনো দোষ নেই।

বর্গি : আর সব দোষ আমার? আমার ব্যাংক, কারখানা সব লুটে নেবে আর আমি চুপ করে সহ্য করব? এ দেশের মালিক আমি, আমার হুকুমে সব চলবে। শাসন, যুদ্ধ, ব্যবসা, বাণিজ্য সব আমি চালাব। এখন কী দেখছ, এই তো শুরু হলো!

দুখু : আমি যদি নিরস্ত্র না হতাম, যদি একটা কিছু অস্ত্র থাকত, তাহলে, তাহলে-

বর্গি : তাহলে কী করতে?

দুখু : আমি জানি না আমি কী করতাম, উঃ দেশে আমার সাত কোটি মানুষ, তোমরা তোমাদের-

[গুলির শব্দ।]

বর্গি : তোমার ভাই বেরাদরকে আমি চিনি, খুব ভালো করে তেইশ বছর ধরে দেখেছি।

দুখু : তুমি কিছু চেনো না, তুমি একাত্তরের বাংলাকে জানো না।

[হুকমতের প্রবেশ।]

হুকমত : বর্গিজি, বুড্ডাটার সিনা ফাটিয়ে দিয়েছি, বুড্ডাটা হাসছে। সফেদ দাড়ির মধ্যে লহু লেগেছে। কাঁচা লহুর মধ্যে শুয়ে ইমানদারের মতন হাসছে, আমার খুব ডর লাগছে।

বর্গি : চুপ করো। ডর কীসের? তোমার হাতে অস্ত্র আছে। ঝকড়ু, যা বুড়ার লাশটা গাড়িতে উঠিয়ে লিয়ে নদীতে ফেলে দে। ভারী ভারী পাথর বেঁধে দিবি।

হুকমত : যা ঝকড়ু, জলদি যা, বুড্ডার হাসি খুব খারাপ।

ঝকড়ু : মালিক, আমি যাব না।

বর্গি : যাবি না? বদমাশ।

হুকমত : ঝকড়ু, জান লিয়ে লিবো।

ঝকড়ু : লিয়ে নে, আমি যাব না।

হুকমত : যাবি না ঝকড়ু?

ঝকড়ু : না।

বর্গি : এক হাজার টাকা দিব।

ঝকড়ু : মালিক!

বর্গি : দু হাজার।

ঝকড়ু : না না।

বর্গি : দু হাজার টাকা, এই নে, ধর।

ঝকড়ু : মালিক!

বর্গি : নে হাতে নে, পকেটে ভরে নে।

[ঝকড়ু হাত বাড়িয়েছে।]

দুখু : ঝকড়ু!

ঝকড়ু : কিছু বোলো না তুমি। টাকা কে দেবে আমাকে?

বর্গি : মারহাবা ঝকড়ু, আরো বকশিশ পাবি।

ঝকড়ু : আপনার দয়া, মালিক।

বর্গি : হুকমত খাঁ, ঝকড়ুকে নিয়ে যাও।

হুকমত : চল ঝকড়ু।

ঝকড়ু : আসেন সিপাহিজি।

বর্গি : যাও, জলদি করো। দুখু মিঞা, দেখলে তো টাকার জোরে কী হয়।

দুখু : ঝকড়ু, যাবি না।

হুকমত : খবরদার, ওকে ডাকবে না।

দুখু : আমি ওকে মেরে ফেলব।

[ঝকড়ু ক্ষিপ্র বাঘের মতো হুকমতকে জাপটে ধরল।]

ঝকড়ু : জয় বাংলা। দুখু ভাই, আমি হুকমতকে ধরেছি, তুমি বর্গিকে ধরো।

[দুখু বর্গিকে ধরেছে।]

দুখু : বর্গি, পকেটে হাত ভোরো না, ওটা আমাদের অস্ত্র।

ঝকড়ু : আরে হুকমত খাঁ, ছুটতে পারবে না। লাশ টানা হাত, তোর কোমর ভেঙে ফেলব।

দুখু : পালাবে কোথায় বর্গি?

বর্গি : টাকা দেবো। এক লাখ, দশ লাখ।

ঝকড়ু : টাকা দিয়ে আমার ইমান লিতে পারবি না বর্গি। এই হুকমত, অস্ত্র ছেড়ে দে। না হলে এই দেখ। মুখ দিয়ে রক্ত এসে যাবে। ছাড়! ছাড়! হা দুখু ভাই, অস্ত্র লিয়ে নাও।

বর্গি : দুখু ভাই, আমাকে রহম করো।

দুখু : তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালোবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভালো হবার নও। এখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেব। তোমাদের পালাবার পথ গুঁড়ো করে দেব আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ। লজ্জায় অপমানে আর পরাজয়ের যন্ত্রণায় তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাগল হয়ে যাবে।

[গ্রেনেড ও গুলির শব্দ।]

দুখু : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

[গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেশাত্মবোধক গানের সুর ভেসে আসছে।]

শব্দের অর্থ

আওলাদ: সন্তান।

আঁসু: চোখের পানি।

আজাদি: স্বাধীনতা।

আলবত: নিশ্চয়।

ওয়াতান: দেশ।

কওম: জাতি।

কিসসা: কাহিনি।

খতম: শেষ।

খয়রাত: দান।

খামোখা: বিনা কারণে।

গাদ্দারি: বিশ্বাসঘাতকতা।

গায়েব: অদৃশ্য।

গোর: কবর।

জুলফিকার: তরবারি।

তড়পানো: অস্থির হওয়া।

তাজিম: সম্মান।

তামাম: সমস্ত।

দিলখোশ: প্রফুল্ল চিত্ত।

পয়মাল: ধ্বংস।

ফানকার: শিল্পী।

বিলকুল: পুরোপুরি।

বুড়ি বাত: মন্দ কথা।

বেয়োনেট: রাইফেলের আগায় লাগানো ধারালো ছুরি বিশেষ।

বেরাদর: ভাই।

মগের মুল্লুক: অরাজক পরিস্থিতি।

মাঙছে: চাইছে।

মুল্লুক: দেশ।

রহম: দয়া।

লহু: রক্ত।

লিবে: নেবে।

লোবান: আতর।

সফেদ: সাদা।

সিনা: বুকের পাটা।

হল্লামাচানেওয়ালা: গোলমাল তৈরি করে যে।

হারগিজ: কোনো সময়ে।

হুকমত: হুকুম।

৬.৪.২ নাটকের কাঠামো বুঝি

‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকটি পড়া হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডান কলামে লেখো। সহপাঠীদের সাথে তোমার উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

নাটকের কাহিনি কী? কাহিনি তুলে ধরার জন্য কোন কোন ঘটনা এসেছে?	
নাটকে কয়টি দৃশ্য আছে? এসব দৃশ্য কোথায় কোথায় ঘটেছে?	
নাটকে কোন কোন চরিত্র আছে?	
নাটকের সংলাপগুলো কাহিনিকে কতটুকু আকর্ষণীয় করেছে?	

৬.৪.৩ জীবনের সাথে নাটকের সম্পর্ক খুঁজি

‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকটি কোন সময়ে এবং কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২। এই নাটকের বর্গিওয়ালা চরিত্রটি তৎকালীন পাকিস্তানের কোন শ্রেণির মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে? এই চরিত্রটিকে নাট্যকার কীভাবে চিত্রিত করেছেন?

৩। নাটকে ঝকড়ু চরিত্রের পরিবর্তন হলো কেন?

৪। বয়োজ্যেষ্ঠ কারো কাছ থেকে শোনা হানাদার বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কোনো নির্যাতন বা গণহত্যার ঘটনা লেখো।

৬.৪.৪ নাটক করি

শিক্ষকের নির্দেশনায় 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকটি অভিনয়ের প্রস্তুতি নাও। সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে নাটকটি মঞ্চস্থ করো।

সপ্তম অধ্যায়

আলোচনা করি, ভিন্নমত বিবেচনায় নিই

পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ

আকিদ বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার মোড়ে আসতেই একটু হকচকিয়ে গেল। দুজন লোক একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছে। আকিদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করল। রাস্তার মোড়ে কয়েক দিন ধরে কে বা কারা ময়লা ফেলছে। এই ময়লা ফেলা নিয়েই তর্কের সূত্রপাত। তাদের কথা শুনে আকিদ বুঝতে পারল, দুজনেই এই এলাকার বাসিন্দা এবং পরস্পরের পরিচিত। একজনের নাম শাফকাত হোসেন এবং আরেক জনের নাম আজমল করিম।

শাফকাত সাহেব বললেন, 'মানুষজনের দায়িত্ববোধের কি এতই অভাব? রাস্তার মোড়ে কেন ময়লা ফেলবে?'

আজমল সাহেব বললেন, 'মানুষ না হয় ভুল করতে পারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কী করছে?'

শাফকাত সাহেব একটু ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন, 'এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শুধু কর্তৃপক্ষের না। আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে।'

দুজনের তর্কের মাঝখানে এলাকার আরো কয়েকজন জড়ো হয়ে গেলেন। কয়েকজন শাফকাত সাহেবের পক্ষে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এবং কয়েকজন আজমল সাহেবের পক্ষে অবস্থান নিলেন। একজন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘এটা কি ময়লা ফেলার জায়গা? এভাবে ময়লা ফেলতে ফেলতে জায়গাটাকে ময়লার ভাগাড় বানিয়ে ফেলবে সবাই। ... যত্তসব!’ আরেক জন শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করলেন, ‘এখানে আগে কখনো ময়লা ফেলতে দেখিনি। আশা করি, বিষয়টা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে এবং আজ-কালের মধ্যেই হয়তো ময়লা পরিষ্কার করে ফেলবে।’ সাদা শার্ট পরা একজন বললেন, ‘আমাদের আবর্জনা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। শুনেছি বিদেশে একেক রকম ময়লার জন্য একেক ধরনের বাক্স থাকে। আর আমরা যা পাই, সব এক জায়গায় ফেলি!’

উপরের নমুনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কী মনে করো? এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি ব্যক্তির না কর্তৃপক্ষের? এ বিষয়ে শ্রেণিতে তোমার মত প্রকাশ করো। এরপর একই বিষয়ে সহপাঠীদের মত নাও। তাদের কোনো ভিন্নমত থাকলে তাও বোঝার চেষ্টা করো। অন্যদের মতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনে নিজের মত সংশোধন করে আবার উপস্থাপন করো।

ক) তোমার বক্তব্যের পিছনে কী কী যুক্তি আছে?

____

____

____

____

খ) তোমার সহপাঠীদের কোন কোন কথার সাথে একমত এবং কোন কোন কথার সাথে একমত নও?

____

____

____

____

____

____

গ) সহপাঠীদের ভিন্নমত প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য কী?

ঘ) আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার মতের কোনো পরিবর্তন করতে চাও কি না? কেন চাও, কিংবা চাও না?

এই আলোচনার সময়ে নিচের বিষয়গুলো কতটুকু বজায় রাখতে পেরেছ, তা যাচাই করো।

মত ও ভিন্নমত	বিবেচ্য	হ্যাঁ/না
মত প্রকাশ	আলোচনার বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিয়েছি।	
	যুক্তিগুলো সাজিয়ে নিয়েছি।	
	নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিতে পেরেছি।	
	নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করেছি।	
ভিন্নমত প্রকাশ	মতের বিপরীতে যুক্তি দিতে পেরেছি।	
	নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করতে পেরেছি।	
ভিন্নমত গ্রহণ	ভিন্নমতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা যুক্তি পেয়েছি।	
	প্রয়োজনে নিজের মত পরিবর্তনের ব্যাপারটি বিবেচনায় রেখেছি।	

আলোচনা-সমালোচনা

মানুষ একজন আরেক জনের সাথে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে। যখন সে কোনো বিষয়ের উপর নিজের মত প্রকাশ করে এবং একইসাথে অন্যের মত শোনে, তখন তাকে আলোচনা করা বলে। এই আলোচনার সময়ে একজন চাইলে আরেকজনের মতের বিপরীতে গিয়ে কথা বলতে পারে। এই বিপরীত মতকে ভিন্নমত বলে। ভিন্নমত প্রকাশের সময়ে নিজের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে হয়। আলোচনার সময়ে নিজের মত প্রকাশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভিন্নমতকে গ্রহণ করতে পারাও গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে কোনো ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হয়। ভিন্নমত গ্রহণ করতেই হবে, এমন নয়। তবে মতের অমিল থাকলেও অপরের মতকে শ্রদ্ধা করতে হয়। ভিন্নমতের যুক্তিকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। কারণ, প্রত্যেকের মতের পিছনে তার নিজের ধারণা ও যুক্তি থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে কথা বলেন। ফলে, যত বেশি আলোচনা হয়, তত বেশি তথ্য জড়ো হয়। এসব তথ্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় যুক্তি। এই যুক্তি ব্যবহার করে আলোচকগণ তাঁদের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। নিজের যুক্তিতে ব্যবহারের জন্য তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হয়। অন্যের তথ্য কতটুকু সঠিক, তাও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

নিজের যুক্তি ও মত প্রকাশের সময়ে আত্মপ্রত্যয়ী থাকতে হয়। তবে শব্দপ্রয়োগ ও অঙ্গভঙ্গি এমন হওয়া ঠিক নয় যা অন্যের মনঃকষ্টের কারণ হয়। মনে রাখতে হবে, সব আলোচনা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-ও পাওয়া যেতে পারে।

আলোচনা-সমালোচনার সময়ে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়:

১. **শান্ত থাকা:** আলোচনার সময়ে শান্ত থাকতে হয়। মত প্রকাশ ও ভিন্নমত প্রকাশের সময়ে আলোচকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি তৈরি হতে পারে। এই অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে আলোচনা এগিয়ে নিতে হয়। নিজের ব্যাপারে সমালোচনা শুনলে প্রথমেই মানুষ আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে তৈরি হয় রাগ ও অন্যান্য নেতিবাচক আবেগ। এসব নেতিবাচক আবেগকে পাশ কাটিয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

২. **ভিন্নমতকে ইতিবাচকভাবে দেখা:** সাধারণত সমালোচনার মাধ্যমে অনেক ছোটো-বড়ো ভুল ধরা পড়ে। ভুল ধরা পড়াই হলো ভুল সংশোধনের প্রথম পদক্ষেপ। তাই সমালোচককে বন্ধু হিসেবে ভাবতে হবে।

৩. **ভিন্নমত বোঝার চেষ্টা করা:** সমালোচক কী বলতে চাচ্ছেন, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সমালোচককে তার মতামত ব্যক্ত করতে সময় দিতে হবে। সমালোচকের সম্পূর্ণ বক্তব্য শোনার পর সেই বক্তব্যের ইতিবাচক দিকগুলো চিন্তা করতে হবে।

৪. **ভিন্নমতের যুক্তিগুলো ভালো করে বুঝে নেওয়া:** ভিন্নমতের জন্য সমালোচককে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। তার বক্তব্য স্পষ্ট করে বোঝার জন্য প্রয়োজনে তাকে কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে।

৫. **নিজের ভুল স্বীকার করা:** অন্যের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মতের কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে তা আনা উচিত। এমনকি, নিজের বক্তব্যে কোনো ভুল থাকলে সেটিও স্বীকার করে নিতে হয়।

৬. **ইতিবাচকভাবে শেষ করা:** আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না-ও যেতে পারে। তা সত্ত্বেও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শেষ করতে হবে। আলোচনার পুরো সময় জুড়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা উচিত।

বইয়ের আলোচনা

কোনো একটি বই নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনা লিখিত হতে পারে, মৌখিকও হতে পারে। বইয়ের আলোচনা করার আগে বইটি ভালোভাবে পড়ে নিতে হয়। একটি বইয়ের আলোচনা একজন করতে পারে; আবার একই বই নিয়ে কয়েকজন দলগতভাবেও আলোচনা করতে পারে।

এখানে হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' বইটির উপর একটি লিখিত আলোচনা দেওয়া হলো:

বইয়ের নাম: আগুনের পরশমণি

লেখক: হুমায়ূন আহমেদ

প্রকাশক: বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

প্রকাশকাল: ১৯৮৬

প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য: ৪৫ টাকা।

হুমায়ূন আহমেদের লেখা 'আগুনের পরশমণি' একটি উপন্যাস। এটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসটিতে মাত্র কয়েক দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঢাকা শহরে একদল গেরিলা যোদ্ধা ঢুকে পড়ে এবং তারা কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেয়। এটি উপন্যাসের মূল কাহিনি।

বদিউল আলম এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে গেরিলা দলের প্রধান। অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য সে ঢাকা শহরে একজন সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই কর্মচারী হলেন মতিন সাহেব, যিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকার একটি একতলা বাড়িতে থাকতেন।

উপন্যাসে অবরুদ্ধ ঢাকার চিত্র ফুটে উঠেছে। ওই সময়ে পাকিস্তানি মিলিটারি ঢাকা শহরকে পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। সময়-অসময়ে কারফিউ জারি করে মানুষকে ঘরে থাকতে বাধ্য করত। কখনো কখনো মানুষকে ধরে, কিংবা বাস থেকে নামিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলত। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার দেখাতে চাইত সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। কিন্তু বদিউল আলম তার দল নিয়ে ঢাকায় ঢুকে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছে, ঢাকা স্বাভাবিক নেই। দেশের অবস্থা জানার জন্য সাধারণ মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শোনার চেষ্টা করত।

অপারেশনে অংশ নিতে গিয়ে বদিউল আলম গুরুতর আহত হয় এবং পরে মারা যায়। উপন্যাসের শেষে হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন: 'আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে।' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসের কাহিনির মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। একইসঙ্গে ঐ পরিস্থিতিতে মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কোন পর্যায়ে ছিল তাও ধরা পড়েছে। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও একদল গেরিলা

যোদ্ধা দেশ স্বাধীন করার পিছনে ভূমিকা রেখেছে, তা এই উপন্যাস থেকে জানা যায়।

উপন্যাসের ভাষা সরল। চরিত্রগুলো জীবন্ত। উপন্যাসটির কাহিনির উপর ভিত্তি করে হুমায়ূন আহমেদ একটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছিলেন।

বইয়ের আলোচনা করার সময়ে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়; যেমন—

- বইয়ের লেখক, প্রকাশক, প্রকাশকাল, প্রচ্ছদশিল্পী ইত্যাদি তথ্য দিতে হয়।
- বইটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত, তা উল্লেখ করতে হয়।
- লেখকের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করতে হয় এবং তা নিজের ভাষায় লিখতে হয়।
- বইয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো তুলে ধরতে হয়।
- বইটির কোনো বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত থাকলে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একই বইয়ের উপর লেখা আলোচনা একেক জনের একেক রকম হয়। আবার একজনের আলোচনার সাথে অন্যরা কোনো কোনো জায়গায় ভিন্নমত পোষণ করতে পারে।

বই/গল্প/কবিতা নিয়ে আলোচনা করি

নিজেরা দলে ভাগ হও। শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে একটি বই, গল্প বা কবিতা বাছাই করো। তারপর সেটির উপর একটি আলোচনা লেখো ও দলের সবার সামনে উপস্থাপন করো। একই বিষয়ের উপর দলের অন্যদের আলোচনা শোনো। এরপর পরস্পরের মতের উপর সমালোচনা করো। এভাবে আলোচনা-সমালোচনার পরে নিজের আলোচনাটি নতুন করে লেখো।

শহিদ নূর হোসেন

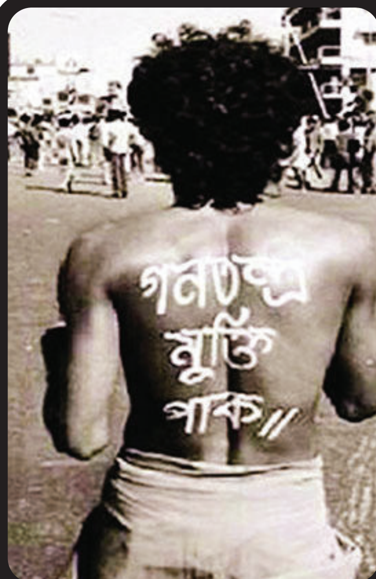

গণতন্ত্রের পথে: নব্বইয়ের গণআন্দোলন

দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর গণতন্ত্রের মুক্তিকামী যোদ্ধা নূর হোসেন তাঁর বুকে ও পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এই শ্লোগান লিখে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। প্রতিবছর এই দিনটি 'শহিদ নূর হোসেন' দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
দাখিল নবম শ্রেণি
বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিদ্যা সজ্জনকে করে বিনয়ী
দুর্জনকে করে অহংকারী

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য